প্রকাশক ঃ

বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিমিটেড-এর পক্ষে

শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস, এম, এ, বি-টি,

২, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯

তৃতীয় প্রকাশ——ডিসেম্বর, ১৯৫৯

"এই গ্রন্থ মুদ্রণের যাবতীয় কাগজ কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত।"

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীচঞ্চল ভাওয়াল, বি. এস-সি

প্রেস্টিজ প্রিন্টার্স

২, রামনাথ বিশ্বাস লেন,

কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(১৫শ ও ১৬শ শতাব্দী)

ভূমিকা

বাংলা ভাষার উদ্ভব

আজ হইতে প্রায় এক হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছে। কিন্তু সেদিন ইহার যে রূপ ছিল, তাহা দেখিলে আজ তাহাকে বাংলা ভাষা বলিয়া চিনিতেই পারা যাইবে না। ইহাকে আদিযুগের বাংলা বা প্রাচীন বাংলা বলা হইয়া থাকে। সেই যুগের ভাষায় মুখে মুখে নানা কাহিনী, গান, ছড়া রচিত হইত, মুখে মুখেই তাহাদের প্রচার হইত, লিখিয়া রাখিবার মত কোনও অক্ষর-জ্ঞান তখনও সমাজের হয় নাই। সুতরাং তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, তবে তাহার কিছু পরবর্তী কালে যখন সমাজের অক্ষর জ্ঞান হইল, তখন পূর্বেকার কিছু কিছু কথা কেহ কেহ লিখিয়া রাখিয়াছিল। এই শ্রেণীরই কিছু গানের পদ রচনার নাম চর্যাপদ। এ দেশে তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় নামক এক ধর্ম সম্প্রদায় ছিল। বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থায় বৌদ্ধধর্মের নানা শাখা ও প্রশাখায় এ দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। এই সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের নানা গূঢ় কথা সে যুগের বাংলা ভাষায় গানের আকারে লিখিত হইয়াছিল। ইহাই চর্যাপদ।

বৌদ্ধ সাধকগণ চর্যাপদগুলির রচয়িতা। ধর্মের তত্ত্ব এবং সাধন-ভজনের কথা ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া বাহির হইতে ইহাদের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—ইহাদিগকে হেঁয়ালী বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাদের ভাষা যে পুরানো বাংলা ভাষা এবং এই ভাষারই ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া যে আধুনিক বাংলা ভাষার বিকাশ হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভুসুকুপাদ নামক একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকের রচিত একটি চর্যাপদ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; বাংলা ভাষার আদি রূপ যে কেমন ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহুঁ কীস।
বেঢ়িল হাঁক পড়ই চৌদীস ॥
অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ্ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥
তিন ন ছুবই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী ॥
হরিণী বোলই হরিণা সুণ তো।
এ বন ছাড়ী হোহুঁ ভান্তো ॥
তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুক ভণই মূঢ়-হিঅহি ণ পইসই ॥

আধুনিক বাংলা ভাষায় যদি ইহা অবিকল অনুবাদ করা যায়, তবে ইহা এই রকম হইবে---

কাহাকে লইয়া ছাড়িয়া আছি কেমনে।
বেড়া হাঁক পড়ে চৌদিকে ॥
আপন মাংসে হরিণ বৈরী।
ক্ষণও না ছাড়ে ভুসুকু শিকারী ॥

তৃণ না ছোঁয় হরিণ না খায় পাণী।
হরিণ হরিণীর নিলয় না জানি ॥
হরিণী বলে হরিণ শোন তুই।
এ' বন ছাড়িয়া হও ভ্রান্ত ॥
উল্লম্ফনে হরিণের খুর না দেখা যায়।
ভুসুকু ভণে মূর্খের হিয়ায় না পশে ॥

আগেই বলিয়াছি, ইহা সাহিত্য নহে, ইহা ধর্ম---তত্ত্বকথাই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; অতএব যাঁহারা এই পথের সাধক তাঁহারা ব্যতীত ইহাদের সুগভীর তত্ত্ব কাহারও বুঝিতে পারিবার কথা নহে, পারেও না। কিন্তু এই সকল সাধন-ভজনের কথার ফাঁকে ফাঁকে ইহাতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক চিত্র, গঙ্গা, যমুনা ও পদ্মানদীর কথা, বাংলার নিজস্ব প্রবাদ-প্রবচন নানা ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। বিভিন্ন সাধকের রচিত এই প্রকার মাত্র ৪৭টি গান চর্যাপদ' নামে পরিচিত---বাংলা ভাষায় ইহাই সব চাইতে পুরানো নিদর্শন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজ লক্ষণসেনদেবের রাজসভায় একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম জয়দেব। তিনি বীরভূম জিলার কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'গীতগোবিন্দ' নামে একখানি গীতিকাব্য রচনা করেন। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী গীতিকারে রচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সংস্কৃত হইলেও ইহার ছন্দ সংস্কৃত ছন্দ নহে বরং বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ। তিনিও তাঁহার রচনাকে পদাবলী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন ইহা প্রথমতঃ তখনকার বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, কিন্তু লক্ষণসেনদেব সংস্কৃত ভাষার চর্চায় উৎসাহ দাতা ছিলেন বলিয়া তাহা তাঁহারই আদেশে শেষ পর্যন্ত সহজ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে, সেইজন্য তাহাতে বাংলা ছন্দটি রহিয়া গিয়াছে। এই কথা সত্য হইতে পারে। সুতরাং তখন হইতেই রাধাকৃষ্ণের কাহিনীতে গীতিকাব্য বা গীতিনাট্য রচনার ধারা এ দেশে প্রচলিত হয়। সেই ধারা অনুসরণ করিয়া সেকালের কয়েকজন কবির আবির্ভাব হয়।

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্য

বড়ু চণ্ডীদাস—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

'চর্যাপদ'গুলি রচিত হইবার পর প্রায় দুই-তিন শত বৎসর পর্যন্ত বাংলা ভাষায় আর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। লিখিতভাবে সেকালে সাহিত্যের চর্চা না হইলেও মুখে মুখে তখন যে নানা দেবদেবীর কাহিনী প্রচারিত হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, ইহার পরবর্তী যুগেই বাংলা সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ আখ্যায়িকা কাব্যের সঙ্গে আমরা পরিচয় লাভ করি। তাহাদেরই বিষয়গুলি এই যুগে মুখে মুখে প্রচার লাভ করিত বলিয়া মনে হয়। চর্যাপদের পরই যে উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।' ইহার রচয়িতার নাম অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, তিনি বড়ু চণ্ডীদাস কিংবা বাসুলী সেবক চণ্ডীদাস বা কেবলমাত্র চণ্ডীদাস বলিয়াও পরিচিত।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনী বাঙ্গালীর নিকট চিরদিনই অত্যন্ত প্রিয়। বহুকাল যাবৎ ইহা বাঙ্গালী কবি ও সাধককে প্রেরণা দিয়া আসিতেছে। বাংলার আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' গীতিকাব্য রচনা করিয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গালীর কানে ও প্রাণে মধুবর্ষণ করিতেছেন। এই রাধাকৃষ্ণেরই প্রেমকাহিনী অবলম্বন করিয়া বাংলার আদিকবি চণ্ডীদাস তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নামক গীতিকাব্য রচনা করেন। তখনও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পথ আগে হইতেই যাঁহারা বাঁধিয়া দিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস অন্যতম। চৈতন্যদেবের জীবন-বৃত্তান্ত যাঁহারাই রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া সর্বদাই জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদগুলি গান করিতেন। এই চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, চৈতন্যদেবের পূর্বে আর কোনও চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বাংলা ভাষা ইহার আদিযুগের অবসানে মধ্যযুগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আদিযুগে ইহার মধ্যে যে অপরিণতি ও অস্পষ্টতা ছিল, তাহা ক্রমে ইহার মধ্য হইতে দূর হইয়া ইহা একটি পরিণত এবং স্পষ্টতর রূপ প্রকাশ করিতেছে। ফলে আধুনিক পাঠকের নিকটও তাহা অনেকখানি বোধগম্য হইয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গৃহকর্মরতা শ্রীরাধিকা ব্যাকুলিতা হইয়া উঠিয়াছেন—

> কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি, কালিনী নই কূলে।
> কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি, এ গোঠ গোকুলে॥
> আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
> বাঁশরী শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
> কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি, সে না কোন জনা।
> দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
> পাখী নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
> মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও॥
> বন পোড়ে আগ, বড়ায়ি, জগজনে জানী।
> মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥

আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

অর্থাৎ কালিন্দী (যমুনা) নদীর কূলে কে বাঁশী বাজায়? গোকুলের গোষ্ঠে কে বাঁশী বাজায়? তাহা শুনিয়া আমার শরীর আকুল ও মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল, বাঁশীর শব্দে আমি রান্না এলোমেলো করিয়া ফেলিলাম। কে বাঁশী বাজায়? সে কে? তাঁহার পায়ে দাসী হইয়া নিজেকে মিশাইয়া দিতে চাই। আমি পাখী নই যে তাহার নিকট উড়িয়া গিয়া পড়িব, মেদিনী-বিদীর্ণ করিয়া দাও, আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া লুকাই। আগুনে বন যখন পোড়ে তখন জগদ্বাসী তাহা দেখে, কুমোরের পনীর মত আমার মন দগ্ধ হয় (তাহা কেহই চোখে দেখে না)। কৃষ্ণের কামনায় (অভিলাসে) আমার অন্তরে সুখ হয়, বাসলী দেবীকে শিরে বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস ইহা গাইল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শ্রীকৃষ্ণের জীবনের জন্মখণ্ড হইতে রাধা বিরহখণ্ড পর্যন্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত করা হইয়াছে, জয়দেবের কয়েকটি পদের বাংলা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। সমগ্র কাহিনীটি একটি গীতিনাট্যের আকারে লেখা। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি চরিত্র—রাধা, কৃষ্ণ, ও বড়ায়ি। এই তিনজনের গীতি-সংলাপের ভিতর দিয়া কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। ইহার শেষ অংশে রাধাবিরহ খণ্ড, তাহা সম্পূর্ণ নাই, খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

ইহার একখানি মাত্র হাতেলেখা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া জিলার গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ীর গোয়াল ঘরে পরলোকগত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় পুঁথিখানির আবিষ্কার করেন। পুঁথিখানির ভাষা বিচার করিয়া ইহাকে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করিয়াছেন।

কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের এই গ্রন্থের কাহিনী ,ভাব এবং চরিত্রের সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের মিল নাই। সেইজন্য অনেকে মনে করিয়াছেন, ইনি অন্য একজন চণ্ডীদাস, ইঁহার নাম অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। কারণ, তিনি এই নামের ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন।

এই কাহিনীর নায়িকা শ্রীরাধিকা যদিও শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি বালিকা মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। দ্বিজ চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা পরিণতা নায়িকা। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব।

বিদ্যাপতি

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর পশ্চিম দিকে বিহারের দ্বারভাঙ্গা জিলার মধুবাণী মহকুমার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি বিদ্যাপতি বর্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত জন্মের সন তারিখ জানিতে পারা যায় না, কিন্তু মিথিলায় যে সকল রাজসভার সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহার বিভিন্ন রচনায় তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার সময় জানিতে পারা যায়। তিনি যে কেবলমাত্র পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, তিনি সংস্কৃত, অবহট্ট ও মৈথিল ভাষায় বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করিয়া সমাজে যশস্বী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বহু স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট

আজ পাঁচ শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া তিনি পদাবলীর কবি বলিয়াই সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছেন। তিনি মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করিলেও মধ্যযুগের বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহার ভাষাকেই আদর্শ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার পদ রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহারা প্রকৃত মৈথিল ভাষার পরিবর্তে মৈথিল ও বাংলা ভাষা মিশাইয়া একপ্রকার ভাষা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই পদ রচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভাষা এক কৃত্রিম ভাষা হইলেও বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাগণের তাহাই আদর্শ হইয়া উঠিল, তাহা ব্রজবুলী ভাষা নামে পরিচিত।

বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন। তাঁহার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নাম ছিল রাজা শিব সিংহ, তাঁহার পত্নীর নাম লছিমা দেবী। বিদ্যাপতি তাঁহার বহু পদে ইহাদের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি নিজের সুগভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

আত্মপরিচয় দিতে গিয়া তিনি নিজের পিতার নামের সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রাণীর নাম এইভাবে স্মরণ করিয়াছেন—

> জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর মৈথিল দেশে করুঁ বাস।
> পঞ্চ গৌড়াধিপ শিব সিংহ ভূপ কৃপা করি লেও নিজ পাশ॥
> বিস্‌ফী গ্রাম দান করল মুঝে রহতহি রাজ-সন্নিধান।
> লছিমা-চরণ-ধ্যানে কবিতা নিকসয়ে বিদ্যাপতি ইহা ভাণ॥

মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলাদেশে প্রচার লাভ করিবার একটি কারণ ছিল। তখন স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে মিথিলায় যাইতে হইত, নবদ্বীপে তখন পর্যন্ত স্মৃতি ও ন্যায়ের টোল স্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গালী ছাত্রেরা মিথিলায় গিয়া স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির অপূর্ব রস ও লালিত্য পূর্ণ পদগুলি শুনিয়া মুগ্ধ হইত, তাহারা তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিত, দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহারাই তাহা প্রচার করিত। তাহার ফলে চৈতন্যধর্ম প্রচারের সময় হইতেই বাংলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার এক প্রবল বন্যা আসিয়াছিল। তখনই এদেশে বিদ্যাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়া বাংলায় পদ রচনা করিবার এক সুগভীর প্রেরণা দেখা দিল। তখন হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর কবিগণ মৈথিল ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ করিয়া ব্রজবুলী ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতেই পদ রচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিদ্যাপতির পদের মৈথিল ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলী ভাষায় রচিত পদগুলির আর বিশেষ কোনো পার্থক্য অনুভব করিতে পারা গেল না। তখন হইতে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই লোকে মনে করিতে লাগিল এবং বৈষ্ণব পদসঙ্কলয়িতাগণ বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদিগের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির পদগুলিও সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি কোনও ভাবেই আর বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত কিংবা অনাত্মীয় থাকিতে পারিলেন না। এমন কি, বাংলা দেশেও অনেকে বিদ্যাপতি নাম লইয়া পদাবলী রচনা করিতে লাগিলেন, অনেক সময় তাঁহাদের রচনা মৈথিল বিদ্যাপতির সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়া কোন্ বিদ্যাপতি মৈথিল এবং কোন্ বিদ্যাপতি বাঙ্গালী এই বিষয়ে পাঠকের ভ্রমোৎপাদন করিতে লাগিল। এমন কি, বহুদিন পর্যন্ত মৈথিল বিদ্যাপতিকেও বাঙ্গালীরা বাঙ্গালী কবি বলিয়াই জানিত।

বিদ্যাপতি পঞ্চোপাসক বা শিব, শক্তি, সূর্য, বিষ্ণু, গণেশ এই পাঁচ দেবতারই উপাসক ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ রচনা করিলেও

অধিকাংশ পদেই তিনি রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করিয়া নায়ক এবং নায়িকার আচরণ এবং মনোভাব মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই কালক্রমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের যুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকাকে আদর্শ নায়ক ও নায়িকা মনে করিয়া তাহাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি বহু সংখ্যক শৈব পদাবলী বা শিবগীতও রচনা করিয়াছেন, তাহা আজ পর্যন্ত মিথিলায় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত আছে।

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি

বাংলাদেশে যে সকল বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ সংকলিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিদ্যাপতির নামে এমন কতকগুলি পদ স্থান পাইয়াছে, যাহাদের ভাষা মৈথিল নহে, ব্রজবুলীও নহে বরং তাহাদের পরিবর্তে সহজ বাংলা; যেমন তাহাদের একটি পদ এই প্রকার---

শুন লো রাজার ঝি,
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি ॥
বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে ॥
দেখাইয়া বদন-চান্দে।
তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহুঁ তুরিতে আওলি লখিতে নারিল
ওই ওই করে কান্দে ॥
হৃদয় দরসি থোর
তার মন করি চোর।
বিদ্যাপতি কহ শুন লো সুন্দরী
কানু জিয়ায়বি মোর ॥

এই পদটি যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস বিদ্যাপতি বাংলা ভাষাতেও পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা সত্য নহে, কারণ, বিদ্যাপতির যে সকল পদ মিথিলায় প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাংলা কোনও পদ পাওয়া যায় না। ইহারা বিদ্যাপতির রচিত হইলে, এমন কোনও না কোনও পদ নিশ্চিতই মিথিলায়ও প্রচলিত থাকিত। এই শ্রেণীর পদগুলি যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত নহে, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় রচিত পদগুলির সঙ্গে ভাবের দিক দিয়া এই পদগুলির আকাশ পাতাল পার্থক্য। এমন কি, ইহাদের বিষয়-বস্তুর মধ্যেও কোনও মিল নাই। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনায় রাধিকার শ্বাশুড়ী, ননদিনী জটিলা-কুটিলার কোনও নামোল্লেখ নাই, কৃষ্ণের সখা রূপেও সুবল কিংবা সুদাম ইহাদেরও নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদগুলির মধ্যে ইহাদের সকলেরই নাম পাওয়া যায়। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির এই নামগুলি যদি জানা থাকিত, তবে তিনি

নিশ্চয়ই মৈথিল ভাষায় তাঁহার রচিত পদাবলীতে তাঁহাদের নামের উল্লেখ করিতেন।

তবে বাংলা ভাষায় রচিত পদাবলীর কবি বলিয়া যে বিদ্যাপতির নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই বিদ্যাপতি কে? কোনও বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি কি বিদ্যাপতি নাম লইয়া পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারই রচিত পদাবলী কালক্রমে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্গে বাংলাদেশে একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে? অনেকে কিন্তু তাহাই মনে করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, একজন বাঙ্গালী কবি বিদ্যাপতি এই নামে বাংলা ভাষা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে কিছু কিছু মৈথিল শব্দ মিশ্রিত করিয়া কিংবা ব্রজবুলী ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে বাঙ্গালী বিদ্যাপতি বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যতদূর জানিতে পারা যায়, এই বাঙ্গালী বিদ্যাপতির 'কবিশেখর' এবং 'কবিরঞ্জন' এই দুইটি উপাধি ছিল এবং ইনি কোনও কোনও স্থলে কেবল মাত্র উপাধিটি ভণিতা রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, কখনও বা নামের সঙ্গে উপাধিটি ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি 'কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি' কিংবা 'কবিশেখর বিদ্যাপতি' বলিয়াও পরিচিত।

কবিশেখর বিদ্যাপতির সময় জানিতে পারা যায়। তাঁহার পদে তিনি গৌড়ের পাঠান নবাব নসিরুদ্দীন নসরত সাহের নামোল্লেখ করিয়াছেন; নসরত শাহ ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালী বিদ্যাপতি মিথিলার কবি বিদ্যাপতির প্রায় দেড়শ বছর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি এইভাবে নসরত শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

কবিশেখর ভন অপরূব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ সাহ ভজল কমলমুখী॥

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি নসরত শাহের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন। সুতরাং এই পদ পরবর্তীকালে বাঙ্গালী বিদ্যাপতি কর্তৃক রচিত, মিথিলার বিদ্যাপতি কর্তৃক রচিত হইতে পারে না। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির প্রকৃত নাম কবিরঞ্জন, তিনি বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ রচনা করিতেন বলিয়া বিদ্যাপতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া কাহারও বিশ্বাস। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা এই পদগুলি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দড়॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে দুর্গতি॥

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় কবির নাম কবিরঞ্জন, শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি রঘু নন্দনের শিষ্য ছিলেন এবং ছোট বিদ্যাপতি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায়, বিদ্যাপতি নামটি তিনি উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, নাম স্বরূপ নহে।

কেহ কেহ আবার অনুমান করিয়াছেন যে, উড়িষ্যার অধিবাসী কবি চম্পতি নামে একজন বিদ্যাপতি উপাধিধারী যে কবি ছিলেন, তিনিই বাংলা ভাষায় বিদ্যাপতির নামে পদগুলি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যার কবি অপেক্ষা

বাঙ্গালী কবিরই বিদ্যাপতির নামে বাংলা পদাবলী রচনা করা সম্ভব। সেইজন্য বিদ্যাপতি উপাধিধারী কবিরঞ্জনই-যে বাঙ্গালী বিদ্যাপতি অর্থাৎ বাংলায় পদ রচনা করিয়া তাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মিলন

কয়েকটি প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলী হইতে জানিতে পারা যায় যে, মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে বাঙ্গালার কবি চণ্ডীদাসের একবার মিলন বা দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যদি তাহা প্রকৃতই হইয়া থাকে, তবে তাহা এক ঐতিহাসিক ঘটনা সন্দেহ নাই। এই প্রকার চারিটি পদের মধ্যে তিনটিই বিদ্যাপতির রচিত পাওয়া যায়, অবশিষ্ট একটির মধ্যে বিদ্যাপতির ভণিতা থাকিলেও তাহা বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া কেহ মনে করেন না। বিদ্যাপতির একটি পদ এই প্রকার—

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস-গুণ
শুনইতে বাঢ়ল রাগ।
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল
বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই ন পারই
চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন গায়ত
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম শ্রবণে তহি জানল
রূপ নারায়ণ গোই॥

অর্থাৎ বিদ্যাপতির গুণের কথা শুনিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, বিদ্যাপতিরও চণ্ডীদাসের গুণের কথা শুনিয়া তাহাকে জানিবার জন্য আগ্রহ হইল। দুইজনেই (পরস্পরকে দেখিবার জন্য) উৎকণ্ঠিত হইলেন। কেবলমাত্র রূপনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া বিদ্যাপতি রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীদাসও থাকিতে না পারিয়া দর্শনের জন্য যাত্রা করিলেন। পথে দুইজনেই দুইজনের গুণ গান করিতে করিতে চলিলেন, দুই জনই দুইজনের হৃদয়ে জাগিয়া রহিলেন। দৈবাৎ (পথিমধ্যে) দুইজনেরই সাক্ষাৎ হইয়া গেল, কিন্তু কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। তারপর পরস্পরের নাম জানিয়া রূপনারায়ণের সাক্ষাতে পরস্পরকে চিনিলেন।

বিদ্যাপতি তাঁহার ভণিতায় প্রায় সর্বদাই রাজা রূপনারায়ণের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন। এই পদটি মিথিলার কবি বিদ্যাপতি রচিত বলিয়াই মনে করা হয় এবং চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলনের কাহিনীটিকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করা হয়। তবে কেহ কেহ এ কথাও বলিয়াছেন যে, যে-চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, সেই চণ্ডীদাস পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাস নহেন বরং 'শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্ত্তনে'র বড়ু চণ্ডীদাস। কারণ, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পরবর্তী কবি; কিন্তু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলনের ঘটনা চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ববর্তী কালেই সম্ভব হইয়াছিল।

অবিসংবাদিত রূপে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনা এই বিষয়ক আরও একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ঘটনাটি সত্য বলিয়াই মনে করা হয়। এই বিষয়ক যে আর একটি পদ পাওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতা থাকিলেও কবিরঞ্জনের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন—

সময় বসন্ত যাম দিন-মাঝহি
বটতলে সুরধুনি-তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মীলল
পুলক কলেবর গীর॥
দুহুঁ জন ধৈরয ধরই ন পার।
সঙ্গতি রূপ নারায়ণ কেবল
দুহুঁক অবশ প্রতিকার॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ নিভৃতে অলাপই
পুছত মধুরস কী।
রসিক হৈতে কিয়ে রস উপজায়ত
রস হৈতে রসিক কহী॥
রসিকা হৈতে রসিক কিয়ে হোয়ত
রসিক হৈতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম প্রেম হৈতে রতি
কিয়ে কাছে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপ নরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
লছিমা পদ করি ধ্যান॥

সুতরাং মনে হইতেছে, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন বিষয়ক যে কাহিনী এ দেশে প্রচলিত ছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই পদটি বাঙ্গালী বা কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি কিংবা অন্য কেহ তাঁহার নামে লিখিয়া থাকিবেন। ইহা মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচিত নহে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলনের কাহিনীটি মধ্য যুগ হইতেই বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত ছিল।

বিদ্যাপতির পদাবলী

বিদ্যাপতি রূপ-রসের কবি ছিলেন, এই বিষয়ে 'গীতগোবিন্দে'র কবি জয়দেবের সঙ্গে তাঁহার কোনও পার্থক্য ছিল না। তাঁহাকে 'অভিনব জয়দেব' বলা হইত। তিনি তাঁহার পদাবলীর প্রথমেই নায়িকার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন,

কি আরে নবযৌবন অভিরামা।
জত দেখল তত কহয়ি ন পারিঅ
ছও অণপম এক ঠামা॥

হরিণ ইন্দু অরবিন্দ করিনি হেম
পিক বুঝল অনুমানি।
নয়ন বয়ন পরিমল গতি তনুরুচি
অও অত সুললিত বাণী॥

অর্থাৎ নব যৌবনের রূপ দেখিতে কত সুন্দর! আমি যাহা দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না, যেন ছয়টি উপমাহীন বস্তু, যথা হরিণ, চন্দ্রমা, পদ্ম, গজরাজ, হেম আর পিক ইহাদের একত্র মিলন হইয়াছে।

নায়িকার পূর্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন,

অবনত আনন কএ হমে রহলিহুঁ
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখ রুচি পিব এ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
তত হু সঞেহঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরন রাখি।
মধুক মাতল উড়এ ন পারএ
তই অও পসারএ পাঁখি॥
মাধবে বোললি মধুর বাণী
সে সুনি মুদু মুঞে কানে॥
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পঁচ বান॥

অর্থাৎ দুই নয়ন-চোরকে নিবারণ করিয়া আমি কিছুক্ষণ মুখ নত করিয়াছিলাম; কিন্তু চাঁদ যেমন চকোরের দিকে ধাবিত হইয়া যায়, তেমনি প্রিয়ের মুখসৌন্দর্য পান করিতে তাহা ধাইয়া গেল। তখনই তাহাকে সবলে ফিরাইয়া আনিয়া চরণে বাঁধিয়া রাখিলাম, অর্থাৎ নত দৃষ্টিতে পায়ের দিকে তাকাইয়া রহিলাম; মধুপানে মত্ত ভ্রমর দুই পাখা মেলিয়াও যেমন উড়িতে পারে না (তেমনই চক্ষু পায়ের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল)। আহা! গুণমণি কি মধুর বাণী উচ্চারণ করিল, শুনিয়া আমি দুই কান মুদিয়া রহিলাম। সেই অবসরে পঞ্চশর তাহার ফুলধনুতে বাণ যোজনা করিল।

এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে, এই সকল পদের মধ্যে কোথাও রাধা কিংবা কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, কেবল মাত্র প্রেমিক নায়ক এবং প্রেমিকা নায়িকার মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ নায়ককেই শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকাকে শ্রীরাধা বলিয়া অনুমান করিয়া তাহা হইতেই দিব্য প্রেমের রস আস্বাদন করিয়াছেন।

নায়ক-নায়িকা ব্যতীত বিদ্যাপতির রচনায় নায়িকার সখী চরিত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারাই বাঙালী বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায় ললিতা-বিশাখার রূপ লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির নায়িকাকে এখানে তাহার সখী উপদেশ দিতেছেন---

কন্টক মাঝ কুসুম পরকাশ।
ভমর বিকল নহি পাবএ পাশ॥
ভমরা ভোল ঘুরএ সব ঠাম।
তোহ বিনু মালতি নহি বিসরাম॥

অর্থাৎ কাঁটার মধ্যে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, ভ্রমর কাছে যাইতে পারে না। ভ্রমর

বিভোল হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; হে মালতি (মালতী ! ফুল) তুমি বিনা তাহার বিশ্রাম নাই !

নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন-

জখনে দুহুঁক দিঠি বিছুড়লি
দুহু মনে দুখ লাগু।
দুহুক আশা দীপ মিঝাএল
প্রেমক আঁকুর ভাঁগু ॥

অর্থাৎ যখন দুইজনের দৃষ্টির ছাড়াছাড়ি হইল, তখন দুইজনের মনেই দুঃখ হইল। দুইজনেরই আশা প্রদীপ নিভিয়া গেল, প্রেমের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া গেল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নৌকাখণ্ড নামক একটি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায়, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় আরোহণ করিয়া সখীদিগের সঙ্গে মথুরার হাটে দুধ দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ও সেই কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন,

কুল গুণ গৌরব শীল উঠে সোভাব্
সবে লয়ে চঢ়লিহুঁ তোহরহি নাব্ ॥
হঠ ন করিঅ কহ্নু কর মোহি পার।
সব তহ বড় থিক পর উপকার ॥
আইলি সখি সবে সাথ হমার।
সে সবে ভেলি নিবহি বিধি পার ॥
হমরা ভেলি কাহ্নু তোহরেও আস।
জে অঁগিরিঅ তা ন হোইঅ উদাস ॥

অর্থাৎ কুল-গৌরব স্বভাব গুণ শীল সব লইয়া তোমার নৌকায় চড়িলাম। হে কানু, তুমি হঠকারিতা করিও না, আমাকে পার করিয়া দাও। জানিও পরোপকারের মত আর কিছু নাই। আমার সঙ্গে যত সখীরা আসিয়াছিল, তাহারা অনায়াসে পার হইয়া গিয়াছে। কানাই, তোমার প্রতি আমার ভরসা, তুমি কখনও নিজের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে না।

নায়িকার অভিসারের বর্ণনায় বিদ্যাপতির তুলনা নাই। তাহাকে এই বিষয়ে বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই পরবর্তী কালে অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সকলে সার্থক হইতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির অভিসার বর্ণনার একটু নিদর্শন এই—

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পড়এ দুরবার।
গরজেঁ তরস মন রোসেঁ বরিস ঘন
সংসঞে পরু অভিসার ॥
সজনী বচন ছড়াইতে মোহি লাজ।
জে হোএত সে হোঅত বরু সবে হম অঙ্গিকরু
সাহসঁ মন দেল আজ ॥
অপন অহিত লেখ কহইতে পরতেখ
হৃদয়ক ন পাইঅ ওল।
চাঁদ হরিণবহ রাহু কবল সহ
পেম পরাভব থোল ॥

অর্থাৎ রজনী অন্ধকার উদ্‌গীরণ করিতেছে, পথে ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গ, বার বার বজ্রপাত হইতেছে, মেঘের গর্জনে মন ত্রস্ত, ক্রুদ্ধ বর্ষা অবিশ্রাম ধারা বর্ষণ করিতেছে, অভিসার আজ সংশয়ের কারণ হইয়াছে। হে সজনি, বলিতে আমার লজ্জা হয়, তবু যাহা হইবার তাহা হোক, সব কিছু স্বীকার করিয়া আমি সাহসে বুক বাঁধিব। আমার অমঙ্গল আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কিন্তু তথাপি আমার কোনও সঙ্কোচ নাই। শশাঙ্ক রাহুর কবল সহ্য করিয়াও হরিণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে, কারণ, প্রেম পরাজয় স্বীকার করিতে পারে না।

তারপর এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি আরও লিখিয়াছেন,

চরণ বেঢ়ল ফণী হিত কএ মানল ধনি
নেপুর ন করএ রোল।
সুমুখী পুছঞো তোহি স্বরূপ কহসি মোহি
সিনেহ কতদূর ওল॥
ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরসেঁ চিহ্নিঅ ভূমি
দিগমগঁ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি শিব শিব তাবে জাইহ জিব
জবে ন উপজু সিনেহ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
গমন না করহ বিলম্বে।
রাজা শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
সকল কলা অবলম্বে॥

অর্থাৎ পায়ে সাপ জড়াইয়া উঠিল, ধনী ইহাকে সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিল, কারণ, নূপুরের শব্দ স্তব্ধ হইল। হে সখী, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আমাকে বল, প্রেমের সীমানা কতদূর? ভুলে এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া থাকে, পায়ের স্পর্শ দ্বারা পথ বুঝিতেছে; দিক এবং পথ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। হায় ভগবান, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমের উদয় না হয়, ততক্ষণ প্রাণ যায় না। বিদ্যাপতি বলেন, হে সুন্দরি, গমনে বিলম্ব করিও না; রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলা বিশারদ।

বিদ্যাপতির একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের নিগূঢ় একটি সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্য প্রকৃতির পটভূমিকায় তিনি নর-নারী মনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

ঘন ঘন গরজয়ে ঘন মেহ বরিখয়ে
দশদিশ নহে পরকাশা।
পথ বিপথহুঁ - চিহ্নয়ে না পারিয়ে
কোন পুরয়ে নিজ আশা॥

অর্থাৎ ঘন ঘন মেঘ ডাকিতেছে, ঘনঘন বৃষ্টি বর্ষণ হইতেছে, দশদিক প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না, পথ বিপথ চিনিতে পারা যাইতেছে না, জীবনের আশা কেমনে পূর্ণ হইবে?

আগেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতি রূপ এবং রসের কবি। কেবলমাত্র বিমূর্ত ভাব-কল্পনার কবি নহেন। ভাব-জগৎ অপেক্ষা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় জগৎ তাঁহার নিকট সত্য। সেইজন্য বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছেন,

আওল ঋতুপতি-রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবি-পন্থ॥

দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড॥

অর্থাৎ ঋতুপতি বসন্তরাজ আসিল। অলিকুল মাধবী কুঞ্জের দিকে ধাবিত হইল, সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইল, কেসর এবং কুসুম কিংবা কেসর পুষ্প হেমদণ্ড ধারণ করিল।

কখনও কবি অনুভব করিয়াছেন, প্রকৃতির পরিপূর্ণতা শূন্য হৃদয়ের বেদনাকে তীব্রতর করিয়া তুলে--- হামার দুখের নাহি ওর,
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

বাহিরের জগতে ভরা ভাদ্রের পূর্ণতা অন্তরের রিক্ততাকে দুঃসহ করিয়া তুলে।

বিদ্যাপতি যে কেবলমাত্র কবিই ছিলেন, তাহা নহে, তিনি একজন পরম সাধক ছিলেন। তিনি যে কয়েকটি প্রার্থনার পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দেখা যায়, তিনি ভগবানের নিকট আত্মসমর্পন করিয়া জীবনে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

অর্থাৎ বিদ্যাপতি অত্যন্ত কাতর-চিত্তে বলেন যে এই ভবসিন্ধু অতিক্রম করিতে তোমার পদপল্লবই একমাত্র অবলম্বন। অতএব আমাকে তাহাতে এক তিল স্থান দাও।

সংসারের অসারতাও তিনি অনুতপ্ত চিত্তে এইভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন,

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল,
অব মঝু হব কোন কাজে॥

উত্তপ্ত সৈকতভূমিতে জলবিন্দু পড়িবামাত্র যেমন শুকাইয়া যায়, আমার অবাধ্য চিত্তও সেইরূপ পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি সমর্পিত হইবার জন্য তোমাকে বিস্মৃত হইল, এখন তাহা দ্বারা আর কি কাজ হইতে পারে?

ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূল কথাটিও তিনি তাঁহার প্রার্থনার পদে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহর সমানা॥

অর্থাৎ কত অসংখ্য ব্রহ্মা জন্মিতেছেন ও পরে মরিতেছেন, কিন্তু তোমার আদিও নাই, অন্তও নাই। সমুদ্রের তরঙ্গের মত কত জগৎ তোমাতে জন্মিয়া তোমাতেই লীন হইতেছে।

বিদ্যাপতি একাধারে পণ্ডিত, কবি, ভক্ত এবং দার্শনিক ছিলেন। পদাবলী রচনার তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যিনি সার্থক ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম গোবিন্দ দাস, তাঁহার উপাধি কবিরাজ। তিনি দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়া খ্যাত। তাঁহার কথা পরে যথাক্রমে বলিব।

অনুবাদ সাহিত্য

ভাগবত

মালাধর বসু—'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'

চৈতন্যদেবের অবির্ভাবের পূর্বেই বৈষ্ণব ভাবধারা যে বাঙ্গালা দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তারপর ক্রমে তাহা বিকাশ লাভ করিতে করিতে চৈতন্যদেব কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত লক্ষ্মণসেনদেবের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও চতুর্দশ শতাব্দীর কবি বড়ু চণ্ডীদাস তাহার প্রমাণ। যাঁহারা তাঁহার আবির্ভাবের পথ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব স্বয়ং সেই সকল পূর্ব সূরীদিগের রচনা পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে ভক্তিরস আস্বাদন করিতেন। চৈতন্যদেবের একজন জীবনীকার লিখিয়াছেন,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

চৈতন্যদেব আরও একজন তাঁহার পূর্ববর্তী কবির রচনার রস আস্বাদন করিতেন, তিনি ভক্তি সাধনার উৎস স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদক মালাধর বসু। তাঁহার অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। বর্ধমান জিলার কুলীন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সন তারিখ জানিতে পারা যায় না, তবে তিনি যে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়া তাহা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, এই কথা তাঁহার রচনায় শকাব্দের হিসাবে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,

তের শ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥

শকাব্দের এই হিসাব হইতে উপরোক্ত খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

গৌড়েশ্বর তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই বিষয়ে তিনি নিজেই সবিনয়ে লিখিয়াছেন,

গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম—গুণরাজ খান ॥

কিন্তু এই গৌড়েশ্বর যে প্রকৃত কে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, এই বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত। তবে তিনি গৌড়ের কোনো স্বাধীন পাঠান নবাব হইবেন, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কাব্যে কবি তাঁহার মাতাপিতার এই পরিচয় দিয়াছেন,

বাপ—ভগীরথ মোর, মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হৈল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি ॥

তিনি বেদব্যাসের স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন—

কায়স্থ কুলেতে জন্ম, কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্ন আদেশে দিলেন প্রভু বেদব্যাস ॥

তাঁর আজ্ঞামত গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন॥

চৈতন্যদেব মালাধর বসুর রচনার মধ্যে সুগভীর ভক্তির স্পর্শ অনুভব করিয়া তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় 'নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই একটি পদ ছিল, পদটি শ্রীচৈতন্য সর্বদা জপ করিতেন। এই সম্পর্কে চৈতন্যদেবের একজন জীবনী লেখক লিখিয়াছেন,

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহাঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
'নন্দ-নন্দন-কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥

শ্রীচৈতন্যদেব এখানে বলিতেছেন, 'নন্দ-নন্দন-কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই পদটি রচনার জন্য আমি মালাধর বসুর বংশের নিকট চিরদিন বিক্রীত হইয়া রহিলাম। কেবল মাত্র তাঁহার বংশধরই নহে, তাঁহার গ্রামের যে কুক্কুর সেও সে'জন্য আমার প্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

সুতরাং মালাধর বসুর উপর শ্রীচৈতন্য দেবের যে কি অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

মালাধর বসু লিখিয়াছেন যে পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ইহা তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছেন। সাধারণ লোক সংস্কৃত ভাষায় ভাগবত পাঠ করিতে পারে না, পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে ভাগবতের কথকতা শুনিতেও বহু অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং লোক-নিস্তারের জন্য তিনি সহজ বাংলা পয়ারে তাহা অনুবাদ করিয়া-ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার, বুঝ মহাসুখে॥
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক-নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত গীতছন্দে গাহি॥
কলিকালে পাপচিত্ত হবে সব নর।
পাঁচালী রসে লোক হইবে বিস্তর।
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥

ভাগবত শ্রবণ করিলে সমগ্র জগৎ-সংসার পাপ-মুক্ত হইবে, এই বিশ্বাস হইতে জনসাধারণের কল্যাণার্থে এই পবিত্র গ্রন্থকে তিনি সহজ বাংলা পয়ারে রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

মালাধর বসু ভাগবতের মাত্র দুইটি অধ্যায় বা স্কন্দের অনুবাদ করিয়াছেন; তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ। তবে কোনও কোনও স্থানে ভাগবতের কিছু কিছু শ্লোকের তিনি আক্ষরিক অনুবাদও করিয়াছেন। তিনি যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মালাধর বসুর পাণ্ডিত্য থাকিলেও তাঁহার রচনা অত্যন্ত সরল ও নিরলঙ্কার।

নিতান্ত অশিক্ষিত লোকও তাঁহার রচনার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারে। মালাধর বসুর ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষতঃ চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে বাংলা রচনায় অলঙ্করণের আধিক্য দেখা যায় না, সহজ এবং সরল ভাষায় ভাব-প্রকাশের প্রবণতা দেখা যাইত। মালাধর বসুর ভাষাও যুগোপযোগীই ছিল। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনী অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও শৈশব লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তারপর তাঁহার বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়া কংসবধ, তারপর দ্বারকায় গিয়া রুক্মিণী ও সত্যভামার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ, পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সৌখ্য, কুরুক্ষেত্রে গমন, সেখানকার যুদ্ধ ইত্যাদি বর্ণনার পর যদুবংশ ধ্বংস এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের স্কন্ধ বা অধ্যায় দুইটি ইহাতে সুপরিচ্ছন্নভাবে বিভক্ত করা হয় নাই। বরং কতকগুলি গীতের নামে নানা রাগ-রাগিণীর নির্দেশ সহ উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহার গীতের সংখ্যা এক শত। এক একটি গীতকে এক একটি পরিচ্ছদ বলা যাইতে পারে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র শেষাংশের বর্ণনা অত্যন্ত করুণ। তাহাতে বলদেবের দেহত্যাগের কথা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

দেখিল সমুদ্র-কূলে এক বৃক্ষ আড়ে।
যোগে বসি বলদেব নিজ তনু ছাড়ে॥
তার মুখ হৈতে এক নাগ বাহিরিল।
মহাকায় শুক্ল বর্ণ তাহাকে দেখিল॥
সহস্র মস্তকে নাগ অনন্তের কায়।
নানা সিদ্ধগণ স্তুতি করন্তি তথায়॥

জরা ব্যাধের লৌহ বাণের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বৃত্তান্ত মালাধর বসুর রচনায় করুণ হইয়া উঠিয়াছে। জরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিল, তখন অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল---

দেখিয়া সম্ভ্রমে ব্যাধ প্রণাম করিল।
যোড় হাতে নিজ অপরাধ মানি নিল॥
অনেক অধর্মে আমি হরিণীর আশে।
তোমাকে না জানি আমি কৈনু বড় দোষে॥
সংসারের নাথ তুমি, সকল বিদিত।
জানিয়ে করহ, যেই হয় ত উচিত॥"
এতেক কাতর বোল শুনি কৃপাময়।
"সুস্থ হয়ে থাক, ব্যাধ, না করিহ ভয়॥"

শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুকালেও নিজের হত্যাকারীর দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ রূপে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সম্পর্কে একটি কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা চরিত্রটি নাই, সুতরাং তাহার কোন অনুবাদেও তাহা থাকিবার কথা নহে। কিন্তু মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' রাধা চরিত্রের উল্লেখ আছে। ইতিপূর্বে রাধার চরিত্র বাঙ্গালীর ভাবনা-চিন্তা ও তাঁহার সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালী কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তাহার প্রমাণ। তাহা ছাড়াও বাঙ্গলা দেশে তখন সংস্কৃত ভাষায় যে সব উপপুরাণ রচিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে রাধা চরিত্রটি স্থান পাইয়াছে। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

তাহার মধ্যে ইতিপূর্বেই রাধা স্থান লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায়ও যাহা রচিত হইয়াছে, তাহাতেও রাধা চরিত্র প্রবেশ করিয়াছে।

'দানলীলা ও পারখণ্ড' রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদিগের রঙ্গকৌতুক মূলক বিষয়গুলি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' নূতন প্রবেশ করিয়াছে, ভাগবতে তাহা নাই।

রামায়ণ

আজ হইতে প্রায় তিন হাজার বছর আগে মহাকবি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তখনও দেশে বৌদ্ধ কিংবা জৈনধর্ম জন্ম লাভ করে নাই। তারপর হইতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রামায়ণের কাহিনী প্রবেশ করিয়াছে। শুধু ভারতবর্ষেই নহে, ভারতবর্ষের বাহিরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যত দেশ এবং জাতি আছে, এমন কি চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশেও রামায়ণের কাহিনী প্রচার লাভ করিয়াছিল; এমন কি, এখন ঐ সমস্ত দেশে বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি জাতির লোক বাস করিলেও তাহাদেরও প্রত্যেকেরই জীবনের মধ্যেই রামায়ণের প্রভাব বর্তমান আছে। ধর্মের মধ্যে না হইলেও প্রত্যেকেরই জাতীয় জীবনের শিল্পসাহিত্যের মধ্যে নানাভাবে এখন পর্যন্তও তাহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণ এইভাবে বিশ্বময় প্রচার লাভ করিবার একটি প্রধান কারণ এই যে, ইহা যে-দেশে যখনই গিয়াছে, তখনই সেই দেশে গিয়া ইহা সেই দেশের ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং সেই অনুবাদ যে সর্বত্রই বাল্মীকির আক্ষরিক অনুবাদ হইয়াছে, তাহা নহে, বরং তাঁহার মূল কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়াও প্রত্যেকেরই জাতীয় জীবনের নানা উপকরণ দিয়া তাহা পরিপুষ্ট করা হইয়াছে। তাহার ফলে প্রত্যেকেই কাহিনীটিকে নিজের দেশের এবং জাতির জীবনের খুব নিকটবর্তী করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম এই কাজটি যিনি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃত্তিবাস। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁহার রামায়ণের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তিনি তাঁহার রামায়ণ-অনুবাদের মধ্যে তাঁহার একটি বিস্তৃত আত্মবিবরণী দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তিনি বিস্তৃতভাবে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলেও তাঁহার রচনার কিংবা জন্মের সন-তারিখটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া যান নাই, সেইজন্য এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলেও তিনি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস তাঁহার জন্মকাল এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,

আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

অর্থাৎ পবিত্র মাঘমাসের সরস্বতী পূজার দিন এক রবিবারে আমি জন্মগ্রহণ করিলাম। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 'পুণ্য' মাঘমাস নহে, তাহা 'পূর্ণ' মাঘ

মাস অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তি হইবে, তাহাদের মতে সে দিন মাঘ মাসের সংক্রান্তি ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা হইতে তিনি যে কোন্ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তবে কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীটি বেশ সবিস্তৃত, তাহার অন্যান্য অংশে যে সকল ব্যক্তি কিংবা ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা হইতেই তাঁহার সময় নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

পূর্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥

অর্থাৎ কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ মহারাজ দনুজ কিংবা দনুজ মর্দনের মন্ত্রী নারসিংহ ওঝা (ওঝা শব্দটি 'উপাধ্যায়' শব্দ হইতে জাত, ইহা ব্রাহ্মণের পদবী, এখনও মৈথিল ব্রাহ্মণগণ যে ঝা পদবী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা ওঝা হইতে জাত) পূর্ববঙ্গে বাস করিতেন, কিন্তু একবার যখন পূর্ববঙ্গে কোনও 'প্রমাদ' বা বিপদ উপস্থিত হইল, তখন তিনি সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বসবাস করিবার জন্য স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অনেকে মনে করেন, এখানে 'প্রমাদ' বলিতে পূর্ববঙ্গে মুসলমান আক্রমণ মনে করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে তুর্কী বিজয়ের আরও প্রায় দেড়শ বছর পর পূর্ববঙ্গে মুসলমান আক্রমণ হইয়াছিল এবং তখনই কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ বাস্তুহারা হইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

তারপর কৃত্তিবাস তাঁহার দীর্ঘ আত্মবিবরণী প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন যে সেখানেই ফুলিয়া নামক গ্রামে নারসিংহ ওঝা তাঁহার বসতি স্থাপন করিলেন। স্থানটির বর্ণনা দিতে গিয়া কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্রপৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥

সেই বংশে পিতা বনমালীর ঔরসে মাতা মালিনীর গর্ভে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥

তাঁহার বংশ ইতিপূর্বেই ফুলিয়ার মুখটি বংশরূপে কুলীন ব্রাহ্মণের সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বনমালীর ছয় পুত্র; প্রত্যেকেই প্রতিভাশালী হইয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস এই ছয় ভ্রাতারই অন্যতম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস তাঁহার শিক্ষারম্ভ সম্বন্ধে তাঁহার আত্ম বিবরণীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই বলি। তিনি বলিয়াছেন,

এগাড় নিবড়ে যখন বারোতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার॥

তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ॥

অর্থাৎ এগার বছর বয়স অতিক্রম করিয়া যখন তিনি বারো বছরে পদার্পণ করিলেন, তখন বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য উত্তর দিকে বড় গঙ্গা পার হইয়া গুরুগৃহে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। সেখানে বিদ্যা সাঙ্গ করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিয়া তিনি গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন।

গৃহে ফিরিবার পথে তিনি মনে করিলেন যে দেশের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি লইয়া যাইতে হইবে। এই মনে করিয়া তখনকার বাংলাদেশের রাজধানী গৌড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজবাড়ীর দ্বারদেশে গিয়া দ্বারীর হাত দিয়া রাজাকে প্রশংসা করিয়া পাঁচটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন—

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥

তৎক্ষণাৎ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি মিলিল। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, 'নয় দেউড়ি পার হৈয়া গেলাম দরবারে।' সেখানে গিয়া দেখিলেন 'সিংহ সম বসে রাজা সিংহাসনোপরে।' সেই রাজসভার তিনি বিস্তৃত একটি বর্ণনা দিয়াছেন। রাজা সেখানে আঙিনার উপর মাদুর পাতিয়া তাহার উপর রেশমী কাপড় বিছাইয়া তাহাতে বসিয়া পাত্রমিত্রসহ মাঘ মাসের শীতে রোদ পোহাইতেছিলেন।

কবি রাজার আসন হইতে মাত্র চারিহাত দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার স্বরচিত শ্লোকগুলি রাজাকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন।

নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন, সভাসদ কেদার খাঁ তাঁহার মাথায় চন্দনের ছড়া দিলেন, তারপরও গৌড়েশ্বর সম্মানস্বরূপ কবিকে বহুমূল্য পটবস্ত্র উপহার দিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কবি, তুমি আর কি চাও, বল,

পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা চাহ মহারাজে ॥

কবি বলিলেন,

কারো কিছু লই নাই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌড়ব মাত্র সার ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয় সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥

কবির মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে আদেশ দিলেন,

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥

তারপর রাজাদেশ শিরোধার্য করিয়া কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদের কার্যে মনোনিবেশ করিলেন।

মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপমায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান॥

দেবভাষায় বাল্মীকি মহামুনি কর্তৃক রচিত রামায়ণ সাধারণ লোকের বোধ-গম্য করিবার জন্য কবি কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় তাহা পদ্যানুবাদ করিয়া প্রচার করিলেন---

সপ্তকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥

আগেই বলিয়াছি, কৃত্তিবাস এত বিস্তৃত করিয়া তাঁহার আত্ম বিবরণীটি রচনা করিলেও তিনি তাঁহার জন্মের সনটি কোথাও উল্লেখ করেন নাই এবং এমন কি, গৌড়েশ্বরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া রাজ-সম্মান এবং রামায়ণ রচনার আদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামটিও বলেন নাই। এমন কি, তাঁহার বর্ণনা হইতে গৌড়েশ্বর হিন্দু রাজা ছিলেন কিংবা মুসলমান নবাব ছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এই বিষয়ে সেইজন্য নানা জনে নানা অনুমান করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, যিনি কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অনুবাদ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু রাজা। বাংলা দেশ মুসলমান বিজয়ের পর একমাত্র যে হিন্দু রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম রাজা গণেশ। সুতরাং তাঁহাদের মতে রাজা গণেশই কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অনুবাদ করিবার আদেশ দিয়া-ছিলেন। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিলে হইবে যে হিন্দুরাজাগণ কখনও দেশের পণ্ডিতদিগকে সংস্কৃতের চর্চা ছাড়িয়া বাংলা ভাষার চর্চা করিতে বলিতেন না। বরং মুসলমান নবাবগণই সংস্কৃত চর্চার অনুরাগী ছিলেন না বলিয়া তাঁহারাই কেবল মাত্র বাংলা ভাষায় চর্চায় উৎসাহ দিতেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদক মালাধর বসুকে একজন মুসলমান নবাব গুণরাজ খাঁ, উপাধি দিয়াছিলেন। সুতরাং যিনি কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অনুবাদ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও একজন গৌড়ের স্বাধীন মুসলমান নবাবই হইবেন।

কেহ কেহ আবার অনুমান করিয়াছেন, রাজা গণেশের যদু নামক যে পুত্র মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দীন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনিই কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অনুবাদ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ, যদু মুসলমান, ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার মধ্যে হিন্দুর সংস্কার বর্তমান ছিল, রাজা গণেশের পুত্র রূপে পিতার মত তাঁহারও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং বিশ্বাস ছিল। তিনি দায়ে পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাল্মীকির রামায়ণকে

বাংলায় অনুবাদ করিতে আদেশ দিতে পারেন না। সেদিনকার সংস্কার অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করা নিন্দনীয় ছিল। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ইঁহারা সংস্কৃত রামায়ণ এবং মহাভারত বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজ তাহাদিগকে 'সর্বনাশা' বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। যেমন, একটি প্রচলিত কথা আছে---

কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁষে
এই তিন সর্বনেশে।

অর্থাৎ কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং বামুন ঘোষ (সম্ভবতঃ কোনও পুরাণের অনুবাদক) এই তিন জন সর্বনাশা। একটি সংস্কৃত শ্লোকেও আছে,

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ কিংবা রামচরিত বা রামায়ণ কেহ যদি বাংলা ভাষায় শোনে, তবে সে রৌরব নামক নরকে যায়। সুতরাং যাঁহার মধ্যে সামান্যও হিন্দুর রক্ত সেদিন বর্তমান ছিল, সেদিন তিনি রামায়ণ কখনও বাংলায় অনুবাদ করিবার আদেশ দিতে পারেন না।

সেইজন্য অনেকেই মনে করিয়াছেন যে গৌড়ের সেই সময়কার একজন স্বাধীন পাঠান শাসন কর্তাই কৃত্তিবাসকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মানিত করিয়া তাঁহাকে রামায়ণ অনুবাদ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিয়াছেন, কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়ের সেই মুসলমান নবাবের নাম রুকনুদ্দীন বরবক শাহ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত জনপ্রিয় গ্রন্থ বাঙ্গালীর নিকট আর কিছু নাই। এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহা প্রায় নিত্যই পঠিত হয়, উৎসবে পার্বণে নানাভাবে ইহার অনুষ্ঠান হয়; এমন কি, শ্রাদ্ধবাসরেও রামায়ণ গান হয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নানাভাবে ইহা বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে।

ইহার জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ এই যে, ইহা বাল্মীকির রামায়ণ হইয়াও কৃত্তিবাসের রচনায় বাঙ্গালীর রামায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে সর্বত্রই সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন নাই। বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার চরিত্র ও নানা চিত্রগুলিকে রূপায়িত করিয়াছেন। বাল্মীকির রচনায় রাবণ এবং লঙ্কার অধিবাসীরা রাক্ষস এবং বীভৎস আচরণকারী। কিন্তু কৃত্তিবাসের রচনায় তাহারা ভক্ত। রাবণও ভক্ত, তবে পূর্বজন্মের একটি অভিশাপ খণ্ডনের জন্য ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর বৈরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; রামচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইলেন না, বরং তাঁহার মুক্তির কারণ হইলেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে হইতেই বাঙ্গালীর হৃদয়ের মধ্যে ভক্তিরসের একটি প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল, কৃত্তিবাস সেই ধারাটিকে আরও একটু বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা তাই বাঙ্গালীর জীবনে সহজ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। যে পারিবারিক জীবনের আদর্শের কথা বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের ভিতর দিয়া প্রচার করিয়াছেন, কৃত্তিবাস তাহাই বাঙ্গালীর গৃহ-সংসার এবং পরিবারের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্য রামচন্দ্র বাঙ্গালীর গৃহের সন্তান, সীতা তাঁহারই গৃহের বধূরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী মেয়েরা যখন বিবাহ উপলক্ষে গীত গায়, তখন রামচন্দ্র এবং সীতাকে তাহাদের নিজেদের ঘরেরই পুত্রবধূরূপে কল্পনা করে। এইভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর নিতান্ত আপনার ঘরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত, বৈষ্ণবীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কল্পনা করিয়া তাঁহার মধ্যে সে তাহার ধর্মীয় আদর্শেরও সন্ধান পাইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ তাহার একদিকে ধর্মগ্রন্থ এবং আর একদিকে সাহিত্য। একের মধ্যে এই দুইয়ের সংযোগে ইহা শক্তিশালী হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণে একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই যে,—'যতদিন পৃথিবীর পৃষ্ঠে পর্বতগুলি থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত নদীগুলি প্রবাহিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনী লোকের মধ্যে প্রচারিত থাকিবে।' বাঙ্গালী সম্পর্কেও এই কথারই প্রতিধ্বনি করা যায়।

চন্দ্রাবতী

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে একজন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাঁহার নাম চন্দ্রাবতী। তিনি বাংলায় মহিলা কৃত্তিবাস বলিয়া পরিচিত। তিনি মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা ছিলেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন দ্বিজ বংশীদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয়, চন্দ্রাবতীও সেই সময়ই বর্তমান ছিলেন। চন্দ্রাবতী পিতার নিকটই রামায়ণের কাহিনী ও পুরাণ-কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥

তাঁহার রচিত রামায়ণ কাহিনী পূর্ব বাংলার নারীসমাজে মুখে মুখেই অধিক প্রচলিত জাতকর্মে অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিবাহে পূর্ব বাংলার মহিলারা তাঁহার রচিত রামায়ণের নানা অংশ গান করিয়া থাকেন। বাল্মিকী এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনেক অতিরিক্ত ঘটনা তাঁহার রামায়ণে স্থান পাইয়াছে। মনে হয়, নানা লৌকিক সূত্র হইতে রামায়ণ কাহিনী শুনিয়া তিনি তাঁহার রচিত রামায়ণে তাহাদের স্থান দিয়াছেন।

ষষ্ঠীবর-গঙ্গাদাস

ষোড়শ শতাব্দীর রামায়ণ রচয়িতা রূপে আর দুইজন কবির নাম একসঙ্গে শুনিতে পাওয়া যায়, ইঁহারা ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন। ইঁহারা পিতাপুত্র। ইঁহাদেরও পূর্ববঙ্গেই নিবাস ছিল। মনে হয়, পিতা ষষ্ঠীবর রামায়ণ অনুবাদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, পুত্র গঙ্গাদাস সেন তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, নতুবা পিতা ও পুত্রের একই গ্রন্থ রচনা করিবার কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। ইঁহারা মহাভারতেরও কোনও কোনও অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনায় করুণ রসের সার্থক প্রকাশ দেখা যায়। পাতাল প্রবেশ কালে গঙ্গাদাসের রচনায় সীতা বলিতেছেন,

সাগর সঙ্গম ভার সহিবার পার।
আমার ভার মা কেন সহিবারে নার॥
অপমান মহাদুঃখ না সয় পরাণে।
মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥

মহাভারত

খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামায়ণের প্রথম অনুবাদ হইয়াছে। যতদূর মনে হয়, সেই শতাব্দীতেই মহাভারতেরও প্রথম অনুবাদ রচিত হইয়াছে। তবে রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাসের সুনির্দিষ্ট জন্মের তারিখ জানিতে না পারা গেলেও তাঁহার কাব্যে এমন কিছু তথ্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সময় সম্পর্কে কিংবা কোথায় তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। কিন্তু মহাভারতের প্রথম অনুবাদক সম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য জানিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে সব কথাই কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে হয়।

মহাভারত গ্রন্থ রামায়ণ হইতে আয়তনে অনেক বড়। সেইজন্য সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ সাধারণতঃ একজন কবির পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, অধিকাংশ কবিই ইহার কেবলমাত্র কোনও কোনও অংশের কিংবা অনেক সময় কেবলমাত্র ইহার মূল কাহিনীর ধারা পরিত্যাগ করিয়া কোনও উপকাহিনীর অনুবাদ করিয়া তাহাই স্বাধীনভাবে প্রচার করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারত আনুপূর্বিক অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন কবির সংখ্যা খুবই নগণ্য, এমন কি কেহ আছেন কিনা, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষতঃ এই পর্যন্ত মহাভারত অনুবাদের যে সকল প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কোনও কবিরই আনুপূর্বিক নিজস্ব রচনা নহে।

সাধারণতঃ এই দেশে যাহারা পুঁথি ব্যবহার করিত, তাঁহারা একজন কবির রচিত সমগ্র পুঁথি কোনদিন ব্যবহার করিত না, তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য যে সকল পুঁথি থাকিত, তাহা মহাভারতের সঙ্কলন পুঁথি মাত্র, তাহাতে বিভিন্ন অনুবাদকের বিভিন্ন অংশের সঙ্কলন থাকিত। কথকতা করিবার কিংবা আসরে দাঁড়াইয়া গাহিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকার সকল বিষয়েরই পুঁথির সঙ্কলন করা হইত। এই রীতি কেবলমাত্র মহাভারতের ক্ষেত্রেই যে প্রচলিত ছিল তাহা নহে; মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, রামায়ণের অনুবাদ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল। সেইজন্য আনুপূর্বিক একজন কবির কোনও পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে নাই। অনেক ক্ষেত্রে একজন কবির হয়ত অনেক বেশি সংখ্যক পদ বিশেষ কোনও পদ সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু একক কবির পদ সঙ্কলন করা কদাচ রীতি-সম্মত ছিল না। বিশেষতঃ রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের একটি পার্থক্য আছে। রামায়ণ কালক্রমে বাঙ্গালী হিন্দুর আচার জীবনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, যেমন কোনও গৃহে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার শ্রাদ্ধের সময় একদিন কিংবা সম্পন্ন ব্যক্তি হইলে একাধিক দিন ধরিয়া তাঁহার গৃহে রামায়ণ গান হইত, ইহা একটি সামাজিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য সংস্কৃত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব'টিও এই উদ্দেশ্যে পাঠ করা হইত।

যাহা আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা সহজে পরিবর্তিত কিংবা বিকৃত হয় না। সেইজন্য রামায়ণ যতখানি অবিকৃত এবং অপরিবর্তিত আছে, মহাভারত তত নাই। ইহার কারণ, মহাভারত রামায়ণের মত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই। যদিচ ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধের সময় মহাভারতের কোনও অংশ যেমন বিরাট পর্ব কিংবা গীতা পাঠ করিবার রীতি আছে, তাহা সত্ত্বেও এই রীতি লৌকিক স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই। কারণ, তাহাতে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত মহাভারত এবং সংস্কৃত গীতা পাঠ করিয়া

থাকেন, সেই পাঠ একান্ত আচার-মূলক; অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত তাহা পাঠ করেন, তাহার প্রায় কোনও শ্রোতা থাকে না, তাহার বাংলা অনুবাদ পাঠ করিবার কিংবা গাহিবার কোনও রীতি প্রচলিত হইতে পারে নাই, সেইজন্য এই দেশের সমাজ রামায়ণ অনুবাদ করিবার প্রেরণা যত লাভ করিয়াছে, মহাভারত অনুবাদ করিবার প্রেরণা তত লাভ করিতে পারে নাই। মহাভারত তাই নিরক্ষর এবং অর্ধনিরক্ষর গায়েনদের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে পাই। একমাত্র কথকতার ভিতর দিয়া এই দেশে মহাভারত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিত। কিন্তু কথকতার কাজ পণ্ডিতেরই কাজ, নিরক্ষর গায়েনের কাজ নহে, সেইজন্য মহাভারত রামায়ণের মত জনসাধারণের স্তরে নামিয়া আসিতে পারে নাই।

একই কারণে মহাভারতের সামগ্রিক অনুবাদও কাহার পক্ষে করা সম্ভব হয় নাই। এমন কি, সে কাজ সহজও ছিল না। তথাপি মধ্যযুগে যে কয়জন কবি মহাভারতের কাহিনী বাঙ্গালী পাঠককে শুনাইবার আগ্রহে মহাভারত অনুবাদের কার্যে অগ্রসর হইয়া অংশতই হউক, কিংবা সামগ্রিক ভাবেই হউক, তাহার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাদের কথা এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে।

সঞ্জয়

যতদূর জানিতে পারা যায়, মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদকের নাম সঞ্জয়। তাঁহার আবির্ভাবের স্থান এবং কাল সম্পর্কে কিছুই সুনির্দিষ্ট ভাবে জানিতে পারা যায় না। তবে নানা কারণে মনে হইতে পারে যে তিনি কৃত্তিবাসের প্রায় সমসাময়িক কালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের স্থান পূর্ববঙ্গ এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ, তাঁহার সকল পুঁথিই পূর্ববঙ্গ বিশেষত, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা এবং ঢাকা জেলা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনায় কৃত্তিবাসের কোনও প্রভাব দেখা যায় না, অবশ্য কৃত্তিবাসের অনুদিত রামায়ণের পুঁথি পূর্ববঙ্গে আসিয়া প্রচারিত হইবার পূর্বেই সঞ্জয় তাঁহার মহাভারত অনুবাদের কার্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ উভয়ের আদর্শ ছিল স্বতন্ত্র, সেইজন্যও পরস্পর পরস্পর দ্বারা প্রভাবিত হইবার কোনও কারণ হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, সঞ্জয় তাঁহার মহাভারতের অনুবাদে অন্য কোনও রামায়ণই হোক কিংবা মহাভারতই হোক, ইহাদের অনুবাদকের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাঁহার কোনও পৃষ্ঠপোষক রাজা বা ভূস্বামীরও নাম উল্লেখ করেন নাই, সেইজন্যই তাঁহার পরিচয় উদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাই হোক, তিনি যে মহাভারতের সর্বপ্রথম অনুবাদক, এখন আর এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন,

সঞ্জয়ে পয়ারে কথা কহিল যেন মত।
হেন মতে কেহ নাহি রচে এ ভারত ॥

শুধু তাহাই নহে, তাঁহার অনুবাদই মহাভারতের বৃহত্তম বাংলা অনুবাদ। (তাঁহার অনুবাদটি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ শ্রীমুনীন্দ্র কুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কলিকাতা, ১৯৬৯)।

সঞ্জয় তাঁহার কাব্যমধ্যে যে সকল ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষা হইতে লোকহিতের জন্য মহাভারতের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

মহাভারতে সঞ্জয় নামে একটি চরিত্র আছে, তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বৃত্তান্ত অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেন। সেই চরিত্রের সঙ্গে কবির নিজের নামের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করিয়া তিনি ভণিতার উল্লেখ করিয়াছেন—

১। ঘটোৎকচ কর্ণের রণ দ্রোণ যে পর্বএ।
সঞ্জয় রচিত কথা কহিল সঞ্জয় ॥
২। তখনে অর্জুন গেল সংসপ্তক রণে।
সঞ্জয়ের দিব্য কথা সঞ্জএ বাখানে ॥

সঞ্জয়ের ব্যবহৃত ভণিতাগুলি হইতে জানিতে পারা যায়, তিনিই সর্বপ্রথম পুরাণ বা সংস্কৃত মহাভারত অনুবাদ করিয়া, তাঁহার নিজের কথায় 'ভাঙ্গিয়া' বাংলা মহাভারত রচনা করিয়াছেন, মহাভারতের কাহিনী সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কবি তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে কেবলমাত্র একটি কথাই বলিয়াছেন যে তিনি 'ভরদ্বাজ গোত্রীয়' ব্রাহ্মণ ছিলেন,

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম ॥

ইহার বেশি আর কিছুই বলেন নাই। তবে তাঁহার আর একটি উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণার সঙ্গে কোনও না কোনও সম্পর্ক ছিল, কারণ, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদানকারী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁহাকে লাউড় ভগদত্ত বলিয়াছেন। লাউড়ের প্রতি তাহার এই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে খুবই তিনি শ্রীহট্ট জিলার লাউড়ের অধিবাসী ছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে লাউড়ে এক অতি প্রাচীন ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন, সুতরাং কবি সঞ্জয় তাঁহাদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমান সত্য হইতে পারে। কারণ, শ্রীহট্ট জিলারই নিকটবর্তী অঞ্চলে তাঁহার বহু সংখ্যক পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। লাউড় সম্পর্কে কবি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই—

১। লাউড় ভগদত্তের কথা দ্রোণ যে পর্বএ।
পয়ার মধুর কথা কহিল সঞ্জয় ॥

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তকে তিনি এখানে শ্রীহট্ট জিলার লাউড়ের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। অন্যত্র তাঁহাকে লাউড় ঈশ্বর বলিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। চৈতন্য পার্ষদ অদ্বৈতাচার্যও লাউড়ের বারেন্দ্র বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সঞ্জয় জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

১। দেবকুলে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার।
সঞ্জয় কবি নামে রচে পাঞ্চালী প্রচার ॥

সঞ্জয় অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত আনুপূর্বিক অনুবাদের দুঃসাহসিক কর্ম যে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার কাব্যের ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন—

১। সঞ্জএ কহিল কবিতা দেবত্ব সর্ব।
শ্লোকবন্ধে ব্যাসকৃত অষ্টাদশ পর্ব ॥
২। ভারত সমুদ্র অতি অন্ধকারময়।
প্রদীপ জ্বালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জয় ॥

বাংলা ভাষা তখন আদরণীয় ছিল না বলিয়া কবি আশঙ্কা করিয়াছেন যে হয়ত

তাঁহার অনুবাদরচনা জনসাধারণ উপেক্ষা করিতে পারে, সেইজন্য তিনি ভণিতায় লিখিয়াছেন—

১। পাঁচালী করিয়া কেহ না করিয় হেলা।
পুরাণ ভারত কথা অমৃত সুখনা॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে বাংলা পয়ারে অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি তখনও সমাজে সমাদর লাভ করিতে পারে নাই।

সঞ্জয় অনূদিত মহাভারতের প্রচার পূর্ববাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল, উত্তরবঙ্গ কিংবা পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার কোনও পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য পূর্ব বাংলায় সঞ্জয়ের পরবর্তী কবিগণ সঞ্জয়ের মহাভারতের অনুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইলেও পশ্চিমবঙ্গের কোনও কবিই যে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী কালে কবি কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদক রূপে সমাজের উপর সার্বভৌম অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহর উপরও সঞ্জয়ের কোনও প্রভাব অনুভব করা যায় না।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দশকে হুসেন শাহ যখন গৌড়ের সুলতান তখন তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র উপাধিধারী পরমেশ্বর নামক একজন কবি সংস্কৃত মহাভারতে বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁহার মহাভারতের অনুবাদ পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত, তিনি তাঁহার অনূদিত মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন যে সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের কাহিনী শুনিতে উৎসুক হইয়া তাঁহাকে সংক্ষেপে তাহার অনুবাদ রচনা করিয়া শুনাইবার জন্য আদেশ দিলেন—

সুলতান আলাপদীন প্রভু গৌড়েশ্বর।
এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার॥
রাঙ্গা টোপর দিল সুবর্ণের তোড়া।
শয়ানে পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া।
শ্রীযুত লস্কর খা অতি যে সুমতি।
এ তিন ভুবনে তেঁহ অনাথের গতি॥
লস্কর পরাগল শুনন্ত কাহিনী।
যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী

কবীন্দ্র পদে পদে লস্কর (সেনাপতি) পরাগল খাঁর প্রশংসা করিয়াছেন।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কেবলমাত্র যে হুসেন শাহর সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন এইটুকুই জানিতে পারা যায়। কবীন্দ্রের মহাভারত পুঁথিখানি যিনি সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি অনুমান করিয়াছেন যে তিনি কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে কবীন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কবীন্দ্রের রচনায় মধ্যে মধ্যে যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, তিনি উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার মহাভারত সারা পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে প্রচার লাভ করিয়াছিল। কবির কাব্যটি মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। তবে তিনি সমগ্র মহাভারতই সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারত অনুবাদের ভূমিকায় গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ্ এবং তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁর এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

নৃপতি হুসেন শাহ্ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন শাহ্ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করি বিষয় পাই আইলন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হইয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পূরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অংশের বর্ণনায় কবীন্দ্র মহাভারতকাহিনীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া অনুভূত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন না। কিন্তু একদিন ভীষ্মার্জুনের যুদ্ধে ভীষ্মের বিক্রম দেখিয়া তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়া ভীষ্মকে অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করিলেন।

তবে কৃষ্ণ সৈন্যাক যে প্রশংসা করন্ত।
আজ ভীষ্ম বীরের করিমু মুই অন্ত॥
ধৃতরাষ্টের পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির রাজাকে যে দিমু রাজ্যভার॥
এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ।
হাতে চক্র লইয়া যায় প্রসন্ন বদন।
রথত্যক্ত হৈয়া তবে চক্র লৈল হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায় ত্রিজগত নাথে॥
কৃষ্ণর যে পদভরে কাঁপে বসুমতী।
মৃগেন্দ্র ধরিতে যায় যেন পশুপতি॥
অস্ত্রক লইয়া ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয় বোলন্ত ভীষ্ম রথের উপর॥
জগতের নাথ আইলা মারিবার মোক।
রথ হোথে পাড় মোক দেখতকে লোক॥
তুহ্মি মোক মারিলে তরিমু পরলোক।
ত্রিভুবনে এহি খ্যাতি ঘুষিবেক মোক॥
দেখিয়া কৃষ্ণের কোপ পাণ্ডুর নন্দন।
রথ হোতে ত্যক্ত হইয়া ধরিল চরণ॥

শ্রীকর নন্দী

পরাগল খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ হুসেন শাহর অন্যতম সেনাপতির পদ লাভ করেন। তিনিও পিতার মত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি

শ্রীকর নন্দী নামক একজন কবিকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরও অশ্বমেধ পর্বের স্বতন্ত্র একটি অনুবাদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি---শ্রীকর নন্দী যাঁহার নাম, কবীন্দ্র পরমেশ্বর কিংবা কেবলমাত্র কবীন্দ্র তাঁহার উপাধি। কিন্তু তাঁহাদের এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি এই যে তাহা হইলে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীর ভণিতায় দুইটি স্বতন্ত্র অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ পাওয়া যাইত না। সুতরাং কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পরাগল খাঁ তাহার পুত্র ছুটি খাঁ একই ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই, বরং তাহারা দুইজন কবিরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। ছুটি খাঁর সময় হুসেন শাহ্ পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। শ্রীকর নন্দী ছুটি খানের এই প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন---

পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা খান মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব-সংহতি ॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্যকথা।
মহামুনি জৈমিনি কহেন সংহিতা ॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥
দেশ-ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগৎসংসার ॥
তাহার আদেশ-মালা মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া ॥

যতদূর মনে হয়, শ্রীকর নন্দীও সংক্ষেপে সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচন করিয়াছিলেন। কিন্তু এত অল্প সময়ের ব্যবধানে পিতা-পুত্রের পৃষ্ঠপোষকতা একই বিষয়ের দুইখানি আনুপূর্বিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

শ্রীকর নন্দী তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছুটি খানের এইভাবে প্রশংসা করিয়াছেন--

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয় ॥
আজানু লম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিশাল হৃদয় মত্ত গজেন্দ্র গমন।
চতুঃষষ্টি কলা বসয় গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্মাইল বিধি ॥
দিতে বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য বীর্য গাম্ভীর্য নাহিক যে সীমা ॥
কপট নাহি যে তার প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥

ছুটি খানের বীরত্বের কথা বলিতে গিয়া কবি আরও বলিয়াছেন,---

ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ ॥

যদ্যপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বসে ত্রিপুর নৃপতি ।।

ষষ্ঠীবর-গঙ্গাদাস

ইহার পর কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী মহাভারত অনুবাদকরূপে আর যে সকল কবির নাম পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই মহাভারতের কেহ বা এক, কেহ বা একাধিক পর্বের অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কয়েকজন কবির নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ঢাকা জিলার জিনারদি গ্রামের অধিবাসী গঙ্গাদাস সেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বটি মাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার রচনায় এইভাবে তাঁহার কুল-পরিচয় দিয়াছেন---

পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্টীবর।
যাহার কীর্তি ঘোষে দেশ-দেশান্তর ।।
জেষ্ঠ্য ভাই সত্যবান্ নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানা শাস্ত্রে বিশারদ গুণে নাহি অন্ত ।।
গঙ্গাদাস সেন কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্যকথা রচিল পয়ার ।।

গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্টীবর সেন সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার স্বর্গারোহণ পর্বটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যে তিনি সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহার কীর্তি লোপ করিবার জন্য তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিবার কথা নহে। সুতরাং মনে হয়, ষষ্টীবরও অন্যান্য বহু কবির মতই মহাভারতের কেবলমাত্র স্বর্গারোহণ পর্বটি অনুবাদ করিয়াছিলেন, হয়ত আরও কোনও পর্ব অনুবাদ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

নিত্যানন্দ ঘোষ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাসের পূর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ নামক একজন কবি সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। তাঁহার রচনা কাশীরাম দাসের অনুবাদের শেষাংশে স্থান লাভ করিয়াছে। কারণ, কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারত রচনা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা দিয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীরাম দাসের পূর্বেই মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, এমন জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। গৌরীমঙ্গলের কবি পৃথ্বচন্দ্র লিখিয়াছেন---

অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ ।।

পশ্চিম বংলার বহু স্থান হইতেই নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত অনুবাদের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কালক্রমে তাঁহার রচনা কাশীরাম দাসের রচনার অন্ত-নিবিষ্ট হইয়া যাইবার ফলে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে।

রামচন্দ্র খান

রামচন্দ্র খান নামক একজন কবি মহাভারতের কেবলমাত্র অশ্বমেধ পর্বখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া নিশ্চিত জানিতে পারা যায়। তবে তাঁহার ভণিতা হইতে মনে হইতে পারে, তিনি সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র খান খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার দুইটি পুঁথিতে দুই রকম। সুতরাং এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি উত্তর রাঢ় অঞ্চলের লোক, এই বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন---

সপ্তদশ পর্ব কথা সংস্কৃত বন্ধ।
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ ॥

রঘুনাথ

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রঘুনাথ নামক একজন কবি 'অশ্বমেধ -পাঁচালী' নামে অশ্বমেধ পর্বের একটি অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবকে তাঁহার রচনাটি শুনাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবি উড়িষ্যায় গিয়া সে দেশের রাজাকে স্বরচিত বাংলা কাব্য শুনাইবার কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি নিজেই এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি নিজের পরিচয় দিয়া উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের নিকট গিয়া বলিলেন---

শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি।
আইলু তোমার দেশে গুণ শুনি অতি ॥
চিরকাল রাজ্য কর উৎকল মাঝে।
পাঞ্চালী রচিয়া আইলু তোমার সমাজে ॥
অশ্বমেধ পাঞ্চালী সে করিয়া কৌতুকে।
আজ্ঞা দেহ আহ্মি পড়ি তোমার সভাতে ॥
শুনিঞা বিপ্রের বোল রাজা হরষিতে।
আজ্ঞা দিল ব্রাহ্মণকে পাঞ্চালী পড়িতে ॥
তখন সে নারায়ণীকে করিল স্মরণ।
পদ-ছন্দে পড়েন্ত যত বীরের চরণ ॥

দ্বিজ অভিরাম

দ্বিজ অভিরামের ভণিতাযুক্ত অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদের পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কবির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দ্বিজ অভিরাম পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ভণিতায় তিনি লিখিয়াছেন,

ভারত-সঙ্গীত কথা ভগবদ-গুণ-গাথা
ভকত জনার সুখ ধাম
কৃষ্ণের দাসের দাস তার পদ করি আশ
বিরচিল দ্বিজ অভিরাম ॥

দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, কিন্তু এই অনুমানের মূলে কোনও যুক্তি নাই।

এই প্রকার আরও বহু কবি রচিত মহাভারতের নানা পর্বের অনুবাদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়াও কঠিন। এই কবিদিগের অসংখ্য অনুবাদ রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাসের অনুবাদ রচনার পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল, কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসকে মহাভারত অনুবাদের নূতন পথ বাঁধিয়া লইবার প্রয়োজন হয় নাই। এমন কি এই সকল বিভিন্ন পরিচিত এবং অপরিচিত কবির রচনা কাশীরাম দাসের অসম্পূর্ণ রচনার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী

তখন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। গৌড়ে স্বাধীন পাঠান নবাবগণ রাজত্ব করিতেছেন। নবদ্বীপ তখন এক অতি সমৃদ্ধ নগর। সেকালের কবি লিখিয়াছেন,

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ ॥
সভে মহা অধ্যাপক কবি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে ॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায় ॥

(চৈতন্য ভাগবত, ১।২)

লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুই-ই তখন নবদ্বীপে বাঁধা। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মানুষ তখন বড় ধর্মবিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মকর্মের মধ্যে লোকে মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাহিয়া জাগরণ করে, ঐশ্বর্য দেখাইবার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া বিষহরীর পূজা করে, আর 'ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।' পুত্রকন্যার বিবাহে ধন অপচয় করে। তাহা ছাড়াও নানাপ্রকার কদাচার সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল,

বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥

সেখানে তখন একজন পরম ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম অদ্বৈতাচার্য। তিনি কি ভাবে এই অধঃপতিত জীবের উদ্ধার হইবে, এই বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করিতেন। তিনি ভাবিলেন, আমার প্রভু যদি বৈকুন্ঠ হইতে আসিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, তবে জীবের উদ্ধার হইতে পারে, তাহা ব্যতীত ইহার আর কোনও উপায় নাই।

নবদ্বীপে আরও একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীরাম পণ্ডিত, তাঁহারা চারি ভাই পরম কৃষ্ণভক্ত। নিজগৃহে তাঁহারা কৃষ্ণনাম জপ, কৃষ্ণকথা পাঠ এবং কখনও কখনও উচ্চকন্ঠে হরিনাম সঙ্কীর্তন করেন। শুনিয়া পাষণ্ডীগণ সর্বদা তাহাদিগকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে।

নবদ্বীপে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নাম জগন্নাথ মিশ্র। তাঁহার পত্নীর নাম শচীদেবী। তাঁহার অনেক পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, একমাত্র যে অবশিষ্ট রহিল, তাহার নাম বিশ্বরূপ। কিছুদিন পরে তাঁহার আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, তাঁহার নাম হইল বিশ্বম্ভর, ডাক নাম নিমাই। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসবের রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ ছিল, তার মধ্যেই বিশ্বম্ভর ভূমিষ্ঠ হইলেন। ক্রমে তিনি বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। শৈশবে নানা অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৈশোরে অত্যন্ত দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীর উপর নানাভাবে উৎপাত আরম্ভ করিলেন। পিতা তাহাকে শাসন করিলেন।

এদিকে যৌবনেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপের সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব দেখা দিল, অবশেষে একদিন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন; কোনদিন তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। মাতাপিতা নিমাইকে লইয়া তাঁহার অভাব ভুলিয়া থাকিতে চাহিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন, সেইজন্য জগন্নাথ মিশ্র মনে স্থির করিলেন, নিমাইকে লেখাপড়া শিখাইবেন না, শচীদেবীও বলিলেন, 'মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাই।' কিন্তু ইহাতে নিমাইর দুরন্তপনা আরও বাড়িয়া গেল, অবশেষে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে তাঁহাকে ভর্তি করিয়া দিলেন। ইতিপূর্বে জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার উপনয়ন দিয়াছিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই জগন্নাথ মিশ্র দেহরক্ষা করিলেন। পুত্রকে লইয়া নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে শচীমাতা সংসার জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নিমাইর বিবাহ হইল। কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যেও শচীদেবী সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নিমাইর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া বহু দিগিবজয়ী পণ্ডিতকেও তিনি পরাভূত করিলেন। নিজেও ক্রমে একটি টোল স্থাপন করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিবার জন্য আসিল।

সেই সময়েই তাঁহার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের ইচ্ছা হইল, কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রায় এক বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর একদিন সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। পূর্ববঙ্গ হইতে গৃহে ফিরিয়া নিমাই এই দুঃসংবাদ শুনিলেন। শুনিয়া 'তুষ্ণী হই রহিলেন সর্ববেদ সার' অর্থাৎ তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়া রহিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই শচীদেবী পুত্রের পুনরায় বিবাহের আয়োজন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। কিন্তু তাঁহার সংসারে আর মন বসিল না। তিনি পিতৃকার্য করিবার জন্য গয়াধামে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। গয়াতে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার নিকট হইতে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া কেবলমাত্র হরি সঙ্কীর্তন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন; টোল ভাঙ্গিয়া দিলেন, সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব ক্রমে প্রকট হইয়া উঠিল। নিমাইর ভাবান্তর দেখিয়া নবদ্বীপবাসী আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল,

পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাই পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥

নবদ্বীপের ভক্তদিগকে লইয়া তিনি দিবারাত্র হরিসঙ্কীর্তনে মত্ত হইয়া রহিলেন। শ্রীবাসের গৃহে প্রতিরাত্রে সঙ্কীর্তন হইতে লাগিল। এমন সময় নিত্যানন্দ নামে একজন অবধূত নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। রাঢ় দেশের একচক্রাগ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি বাল্যেই এক সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তারপর ভারতের সর্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া নিমাইর সঙ্গে মিলিত হইলেন।

বহু ভক্ত নানাদিক হইতে নবদ্বীপে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। সংকীর্তনে তাঁহাদের শক্তি বাড়িতে লাগিল। তাঁহাদের সঙ্কীর্তনের ফলে নগর-বাসী উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা গিয়া কাজীর কাছে বৈষ্ণবদের নামে অভিযোগ করিল। কাজী নবদ্বীপে সঙ্কীর্তন নিষেধ করিয়া দিলেন। শুনিয়া,

একদিন নিমাই নিত্যানন্দকে পুরোভাগে করিয়া এক বিরাট সঙ্কীর্তনের দল লইয়া গিয়া কাজীর বাড়ী আক্রমণ করিলেন। কাজী সঙ্কীর্তনের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই নিমাই স্থির করিলেন, তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। তারপর এক রাত্রে বিধবা মাতা শচীদেবী ও নিঃসন্তানা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংসারে ফেলিয়া রাখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন। কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীয় নিকট হইতেসন্ন্যাসে দীক্ষা লইলেন, মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ও দণ্ড ধারণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন, অবশেষে জীবনের শেষ ১৮ বৎসর কাল পুরীতে বাস করেন, সেখানে ৪৮ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, বিজয়নগরের রাজমন্ত্রী রামানন্দ, হুসেন শাহর মন্ত্রী দাবির খাস ও শাকর মল্লিক ইহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেষোক্ত দুইজন রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব যে ধর্ম প্রচার করেন তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত। ইহা ক্রমে বাংলাদেশ, সমগ্র উড়িষ্যা, আসামে মণিপুর, দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারতে বৃন্দাবন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ইহার মূল কথা 'কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সঙ্কীর্তন'। যে প্রকৃত ভক্ত, সেই ভগবানকে পায়; উচ্চকুলে জন্ম, তীর্থ-ভ্রমণ, দান-অধ্যয়ন ইত্যাদির দ্বারা কেহ ঈশ্বরকে পায় না। তাঁহার কথায়, 'প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে।'

সমসাময়িক বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি

চৈতন্যদেবের জন্মের মাত্র ৮ বৎসর পর হুসেন শাহ স্বাধীন সুলতানরূপে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্বে নবদ্বীপে ভক্তদিগকে লইয়া সংকীর্তন করিবার কালে হুসেন শাহ সুলতানরূপে গৌড়ের মসনদে আসীন ছিলেন। হুসেন শাহ চৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ভক্তগণসহ সর্বত্র কীর্তন করিবার অবাধ অধিকার দিয়াছিলেন। হুসেন শাহের দুইজন মন্ত্রী শাকর মল্লিক ও দবিরখাস চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবধর্মের চর্চা করিয়া দুইজন যশস্বী হন। একজন শ্রীরূপ গোস্বামী আর একজন শ্রীসনাতন গোস্বামী নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহারা নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করেন।

হুসেন শাহ বাংলা সাহিত্যেরও উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। সে-যুগের কবি বিজয়গুপ্ত তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্যে হুসেন শাহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন,

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহা নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিলা পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গা রোড়া তক্‌সিম॥

সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলীতেও হুসেন শাহের এই প্রকার প্রশংসা করা হইয়াছে,

শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সোহ এহি রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান।

ইহার অর্থ এই যে, যশোরাজ খান নামক কবি বলিতেছেন যে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর শ্রীযুক্ত হুসেন (শাহ) জগতের ভূষণ এবং পুরন্দরের (পুরন্দর খাঁর) ভোগের কারণ স্বরূপ।

পুরন্দর খান্ নামে তাঁহার সভায় একজন সভাসদ ছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায়, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই তাঁহার সভায় সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার দুইজন মন্ত্রী চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য ও ভক্তিতে তাঁহার চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

হুসেন শাহের একজন সেনাপতির নাম ছিল পরাগল খাঁ। হুসেন শাহ তাঁহাকে মগ সৈন্যদিগকে দমন করিবার জন্য পাঠান। তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধিধারী একজন বাঙ্গালী কবিকে মহাভারত অনুবাদ করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। সেই মহাভারতের নাম 'পরাগলী মহাভারত'। তাহাতেও কবি হুসেন শাহের গুণকীর্তন করিয়াছেন,

নৃপতি হুসেন শাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার॥

হুসেন শাহের পুত্রের নাম নসরত শাহ। তিনিও পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া বাংলা সাহিত্যের রচনায় উৎসাহ দিতেন। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে,

সে যে নাসিরা শাহ্ জানে,
যারে হানল মদন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

নসরত শাহ বৈষ্ণবপদাবলীর রস আস্বাদন করিতেন বলিয়া মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের সেই যুগের আর একজন মনসামঙ্গলের কবিও তাঁহার কাব্য রচনার কালনির্দেশ করিতে গিয়া হুসেন শাহের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কবির নাম বিপ্রদাস পিপিলাই। তিনি লিখিয়াছেন,

সিন্ধু ইন্দু বেদ শশী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ যখন গৌড়ের সুলতান তখন তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল।

সে-যুগের বাঙ্গালী কবিদিগের হুসেন শাহ সম্পর্কে এই প্রকার সশ্রদ্ধ উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার সুশাসনে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনায় কবিগণ উৎসাহ লাভ করিয়াছেন।

হুসেন শাহের রাজত্বকালে গৌড় বাংলার রাজধানী হইলেও নবদ্বীপই

বিদ্যাশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র ছিল। নানা দেশ হইতে লোক আসিয়া নবদ্বীপে বিদ্যালাভ করিত। সেই সময়কার একজন কবি নবদ্বীপ সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়॥

এই কথা আগেও একবার উল্লেখ করিয়াছি।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের প্রভাব

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও ধর্ম প্রচারের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারাই পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, বহু নূতন নূতন ধারার সৃষ্টিও হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম প্রচারের ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রভাব চারিশত বৎসর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলা ভাষার গীতিপ্রবণতা যে কত গভীর এবং সার্থক, তাহা ইহা হইতে জানিতে পারা যায়। ইহা রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রণয়লীলা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও মানবিক অনুভূতির সুকোমল স্পর্শে সরস, সেইজন্য কেবল মাত্র ভক্তেরই তাহা পাঠ্য নহে, বিদগ্ধ মনও ইহার মধ্যে কাব্যরস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যে জীবন-চরিত সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। ইতিপূর্বে সাহিত্যে আমরা কেবলমাত্র দেবদেবীর কাহিনীই শুনিয়াছি, কিন্তু চৈতন্যদেবই সর্বপ্রথম মানবদেহে দেবোপম চরিত্র লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি জীবনী রচনার প্রথম অবলম্বন হইতে পারিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের জীবনী-ভিত্তিক সে যুগে দুইখানি শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, একখানি বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত', আর একখানি কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ এই গ্রন্থ দুইখানি বাংলাভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

চৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারের ফলে বহু সংস্কৃত পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদের একটি ধারা রচিত হইল। বহু বৈষ্ণব কবি এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং মঙ্গল-কাব্যের উপর গিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। বহু মঙ্গলকাব্য বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গলকাব্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শে রচিত হইল, মঙ্গলকাব্য কিংবা বহু আখ্যায়িকা কাব্যের নায়কচরিত্র চৈতন্যদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নূতন শক্তি লাভ করিল। বাংলা রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদের মধ্যেও চৈতন্যদেবের ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়া রামচন্দ্রকে এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্থাপন করিল। তাহার ফলে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ অনুবাদের সঙ্গে বাঙ্গালী জনসাধারণের অন্তরের যোগ অতি সহজেই স্থাপিত হইল। ক্রমে চৈতন্যের জীবনীর অনুকরণে চৈতন্যদেবের পার্ষদদেরও জীবনী রচনার প্রথার প্রবর্তন হইল। তাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য প্রায়ই বিশেষ কিছু না থাকিলেও তাহা দ্বারা বাংলা ভাষার যে অনুশীলন হইত, তাহাতে বাংলা ভাষা নানা দিক দিয়া উন্নত হইতে লাগিল। বাংলা সাহিত্যের গ্রাম্যতা দূর হইয়া রুচি উন্নত হইল; বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্তপদাবলী রচিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্যচরিত সাহিত্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই ভাবের এক নূতন জোয়ার আসিল। যে সকল ভাবধারা ইতিপূর্বে অত্যন্ত ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে দুই কূল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল, তারপর নূতন নূতন ধারারও সৃষ্টি হইল। নূতন ধারার মধ্যে চৈতন্যদেবের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় এক বিপুল এবং সমৃদ্ধ জীবনীসাহিত্য রচনার সূত্রপাত হইল। ইহা একদিক দিয়া বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করিল, তেমনই জীবনচরিত রচনার একটি নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। তাহার ফলে মধ্যযুগের যে সকল ধর্মসাধক ও কবি সম্পর্কে আমাদের কোনও ঐতিহাসিক জ্ঞান থাকিবার কথা ছিল না, তাঁহাদের সম্পর্কেও নানা তথ্য সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল। মহাপুরুষের জীবনমাত্রই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়, চৈতন্যদেবেরও তাহাই হইত, কিন্তু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেই তাঁহার পার্ষদ এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ শিষ্যদিগের মধ্যে শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পার্ষদদিগের জীবন-কাহিনী লিখিয়া রাখিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের সম্পর্কে নানা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য আমরা জানিতে পারিতেছি। নতুবা চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কালে বাংলা দেশে যে সকল কবি ও সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের সকলের জীবনই কিং-বদন্তীতে পরিণত হইয়া আছে। সেই যুগে চৈতন্যদেবকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ যদি সাহিত্যের আকারে তাঁহার জীবনচরিত রচনা না করিতেন, তবে তাঁহার সমগ্র জীবনই কিংবদন্তী স্তূপে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত; তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত কোনও কথা আমরা জানিতে পারিতাম না।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দেবদেবী বিশেষত চণ্ডী, মনসা ও রাধাকৃষ্ণের বৃত্তান্ত লইয়া বাংলায় কাব্য রচিত হইত। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালীর ইতিহাসে এমন কোনও চরিত্র তখন ছিল না, যাহা আদর্শ করিয়া কোনও জীবন-চরিত রচিত হইতে পারিত। চেতন্যদেব নিজের জীবন এবং আচরণ দিয়া বাঙ্গালী সমাজের সেই অভাব দূর করিলেন। সমাজের সামনে তাঁহার প্রত্যক্ষ জীবনই সাহিত্যে জীবন-চরিত রচনার আদর্শ স্থাপন করিল।

১। গোবিন্দ দাসের কড়চা

চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করিয়া যে চরিত-কাব্য রচিত হইতে আরম্ভ করে, তাহার প্রথমেই গোবিন্দ দাসের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি শ্রীচৈতন্যের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেন নাই, তথাপি তিনি চৈতন্যদেবের জীবনীর যে অংশ রচনা করিয়াছেন, তাহা একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিংবা কাহারও নিকট কিছু শুনিয়া তিনি কিছু লিখেন নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর গোবিন্দ দাস দুই বৎসর কাল তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন, তখন চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় গোবিন্দ দাস চৈতন্যদেব যাহা করিয়াছেন, যেখানে যেখানে গিয়াছেন, যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার

সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তিনি যাঁহাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকল বৃত্তান্ত খুঁটিনাটি করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেই সংক্ষিপ্ত দিনলিপি বা ডায়েরী রচনাকেই 'কড়চা' বলিত। গোবিন্দ দাস সেই ভাবেই তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনাকেও কড়চা বলে। এইভাবে সংস্কৃতেও কড়চা লিখিত হইয়াছে, চৈতন্যদেবের সতীর্থ মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে যে কড়চা লিখিয়াছিলেন, তাহা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে চৈতন্য-জীবনীর একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া আছে।

গোবিন্দ দাসের কড়চা চৈতন্যদেবের মাত্র দুই বছরের দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণের বিষয় লইয়া রচিত। গোবিন্দ দাস উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না, সাধারণ শিক্ষিত মাত্র ছিলেন, সেইজন্য তিনি চৈতন্যধর্মের তত্ত্বকথা কিংবা কোনও গভীর শাস্ত্রীয় আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, দাক্ষিণাত্যের ভক্তদিগের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যে তত্ত্বালোচনা হইয়াছে, তাহার বিবরণ তিনি লিখিতে পারেন নাই। তিনি চৈতন্য জীবনীর সেই দুই বছর কালের ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়াছেন মাত্র। তথাপি তিনি তাঁহার রচনায় যে তথ্যগুলির সন্ধান দিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও সূত্র হইতে উদ্ধার করা কঠিন হইত। অবশ্য অনেকে এই রচনাখানিকে প্রামাণিক কিংবা চৈতন্যদেবের জীবনী বিষয়ক নির্ভরযোগ্য রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

চৈতন্যদেবের অনেক জীবনী লেখকই চৈতন্যদেবকে দেখেন নাই, তাঁহার কোনও আচার-আচরণেরই তাঁহারা সাক্ষী হইতে পারেন নাই; অন্যের নিকট শুনিয়া, তাঁহার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ দাস চৈতন্যদেবকে দুই বছর কালের মধ্যে প্রত্যহ দেখিয়াছেন, তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্তের খুঁটিনাটি ঘটনার তিনি সাক্ষী ছিলেন। তিনি সেই সকল ঘটনা সহজ এবং সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোনও তত্ত্বের সন্ধান করিতে গিয়া ঘটনাগুলিকে জটিল কিংবা দুর্বোধ্য করিয়া তুলিতে যান নাই। তথাপি চৈতন্যদেবের ভাবাবেশ বর্ণনার চিত্রটিকে এমনই ভাবে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন,—

কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য ভাব কভু দেখি নাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতিউতি চায়॥
কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥
উপবাসে কাটি যায় দুই একদিন।
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥

কোনও কোনও সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়াও গোবিন্দ দাসের স্বভাব-কবির মন যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও তিনি তাঁহার রচনায় গোপন করেন নাই। চৈতন্যদেবের নীলগিরি ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি নীলগিরি পর্বতমালার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত—

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে।
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য তাহার ভাব শোভিছে চড়ায়॥

বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া।
চাদর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া ॥

চৈতন্যদেবের সঙ্গে কন্যাকুমারীতে পৌঁছিয়া গোবিন্দ দাস মহাসমুদ্রের বিশালতা দেখিয়া বিমুগ্ধ বিস্ময়ে লিখিয়াছেন---

কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই।
পর্বত কানন দেশ নাই সেই ঠাঁই ॥
হু হু শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥

গোবিন্দের কড়চা এই প্রকার আদ্যোপান্ত পাণ্ডিত্যের ভারমুক্ত, সহজ এবং সরল, নিতান্ত স্বভাব-কবির আড়ম্বরহীন রচনা, ইহা অন্তর স্পর্শ করিলেও যাঁহারা তত্ত্বসন্ধানী তাহাদের কোনও উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারে না।

তথাপি গোবিন্দের রচনা হইতে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এমন কতকগুলি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনী লেখকগণ নিজেদের সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠীর স্বার্থে বিকৃত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান বিষয় চৈতন্যদেবের পরমত-সহিষ্ণুতা। তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক হইলেও হিন্দুর কোনও দেবদেবীর প্রতিই তাঁহার অশ্রদ্ধা কিংবা অবিশ্বাস ছিল না। যে শাক্ত মন্দিরের আঙ্গিনা প্রতিদিন পশুরক্তে রঞ্জিত হইতেছে, তিনি তাহার ধূলিতেও গড়াগড়ি দিয়া শাক্ত দেবীর প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার কোনও ধর্মের বিষয়েই নিজের মনে কোনও সঙ্কীর্ণতা ছিল না। এই উদার এবং বিশাল হৃদয়ের মধ্যেই তাঁহার প্রেমধর্মের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ পরধর্ম বিষয়ে এই উদার মনোভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহার ফলে নানা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ইহার শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

বর্ধমান জিলার কাঞ্চননগর নামক গ্রামে শ্যামাদাস কর্মকারের পুত্র গোবিন্দ কর্মকারের জন্ম হয়। তিনি ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে, আসেন, সেখানে গঙ্গাতীরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার চৈতন্য-দেবকে প্রথম দর্শনের কথা তিনি এই ভাবে লিখিয়াছেন।

কটিতে গামছা বাঁধা অপূর্ব দর্শন।
সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন বদন ॥

যে অবধূতের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ ইতিপূর্বেই নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যর গোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছেন। গোবিন্দ নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ এবং তাঁহার পরিবার সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর ॥
শান্তমূর্তি শচীদেবী অতি খর্বকায়।
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায় ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী ॥
লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ।
মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস ॥

গোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের পরিবারের পরিচালক বা ভৃত্য রূপে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। ইহার পরের বৎসরই চৈতন্যদেব যখন গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস

গ্রহণ করিলেন, তখন গোবিন্দও তাঁহার সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিত্য পরিচর্যার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিলেন।

গোবিন্দের রচনা হইতে চৈতন্যদেবের জীবনের একটি সুন্দর এবং সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

২। জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

গোবিন্দ দাসের কড়চার পর চৈতন্যজীবনী বিষয়ে যে গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য তাহার নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'; রচয়িতার নাম জয়ানন্দ। তিনি বর্ধমান জিলার আমাইপুরী নামক গ্রামে সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্ররূপে এক পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সময় ১৫১১ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তাঁহার পরিবার যে কেবল মাত্র পাণ্ডিত্যের জন্যই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহা নহে, তাহাতে অনেক ধার্মিক ব্যক্তিরই জন্ম হইয়াছিল। কথিত আছে যে, চৈতন্যদেব একবার পুরী হইতে বর্ধমানে যাইবার পরে আমাইপুরী গ্রামে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন জয়ানন্দ শিশুমাত্র, বয়স দুই বৎসর। চৈতন্যদেবই শিশুর জয়ানন্দ নামকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

জয়ানন্দ পরিণত জীবনে চৈতন্যদেবকে না দেখিলেও তিনি যখন তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক চৈতন্যের জীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষদর্শীদিগের অনেকেই বাঁচিয়া ছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহাদের মুখ হইতে শুনিয়া তাঁহার জীবনী সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া নির্ভরযোগ্য। তবে তিনি এমন কতকগুলি তথ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যান্য জীবন-চরিতের মধ্যে তাহাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। সেই জন্য অনেকেই বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যগণ অধিকাংশই গ্রন্থখানি গ্রহণ করেন নাই। তথাপি চৈতন্যদেবের জীবনী বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থখানি ঐতিহাসিকদিগের নিকট বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে তাঁহার নানা জীবনীতে নানা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জয়ানন্দ এই বিষয়ে যে কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আর কাহারও রচিত চরিতকাব্যে পাওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে করিয়াছেন যে ইহাই এই বিষয়ের প্রকৃত তথ্য। তিনি লিখিয়াছেন, একবার আষাঢ় মাসে পুরীতে সংকীর্তনে নৃত্য করিবার কালে তাঁহার পা ইষ্টকবিদ্ধ হয়, তাহাই ক্রমে দূষিত ক্ষতে পরিণত হইয়া যায়, ফলে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং তাহাতেই দুই দিনের মধ্যেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

কিন্তু অনেকেই মনে করেন, এই ভাবে চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটিলে এই কথা জনসাধারণের মুখে মুখে বহুল প্রচার লাভ করিত। বিশেষত আষাঢ় মাসে পুরীতে রথের সময় বাংলা দেশ হইতে বহু ভক্ত পুরীতে রথ দেখিতে এবং চৈতন্যদেবের দর্শন লাভের জন্য যাইতেন। সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে ঐ ঘটনা ঘটিলে বাংলাদেশে তাহা মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু জয়ানন্দ ব্যতীত চৈতন্যদেবের আর কোনও জীবনীকার এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি, এই ভাবে তিরোধান ঘটিবার কাহিনী বাংলা দেশের জনশ্রুতিতে শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং জয়ানন্দের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। আবার ইহাকেই এই বিষয়ে একমাত্র সত্য ঘটনা বলিয়াও অনেকে

বিশ্বাস করিয়াছেন। যাই হোক্, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রকৃত তথ্য কোনও চরিতকারই প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন না।

চৈতন্যদেবের জন্মের এক বছর আগেই বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া জয়ানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কেহ অস্বীকার করেন নাই। সেই সময়ে নবদ্বীপে যে 'রাজভয়' বা রাজার অত্যাচার হইয়াছিল, জয়ানন্দের বর্ণনা সেই ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ।

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর-দ্বার লোটে তার সেই পাপে বান্ধে॥
দেউল দেহড়া ভাঙে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥

চৈতন্যদেবের জন্মের পর নবদ্বীপ এই দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল।

জয়ানন্দের রচনা নানা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ বলিয়া ইহার মধ্যে সহজ কবিত্বের পথ অনেকখানি রুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহার অস্তিত্ব যে অনুভূত হয় না, তাহাও নহে, শিশু নিমাইর রূপ বর্ণনায় জয়ানন্দের রচনায় বৈষ্ণব পদাবলীর সুর শুনিতে পাওয়া যায়—

কুন্দ কলিকা দুটি দন্ত উঠিল।
পাকা তেলাকুচা যেন অধরে ফুটিল॥
টাড় মগর হার চরণে মগরা।
রাঙা লাঠি সোনার কাঠি রূপের পসরা॥
দেখিয়া মোহন-ছান্দ চান্দ রহি চাহে।
মদন লাখ কোটি রূপে মূর্চ্ছা যাএ॥
দেখি মিশ্র পুরন্দর আনমনে নাচ্ঞি।
খাইতে শুইতে ডাকে বাপুরে নিমাঞি॥

শুধু ঐতিহাসিক তথ্য নহে, তাঁহার রচনায় কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা এবং ভক্তিতত্ত্বের নানা কথাও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়—

সম্পদ বিপদ যত সব কর্মফল।
আন গাছে নাহি লাগে আনের বাকল॥
এক তরু হইতে ভিন্ন ফল নাহি ধরে।
আন তরু আন ফল ধরিতে না পারে॥
কালসূত্রে বদ্ধ জীব কর্ম করায়ে কালে।
অগাধ জলের মৎস্য বন্দী হয়ে জালে॥

জয়ানন্দ তাঁহার একটি আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার জন্ম। তাঁহার জননীর নাম রোদনী; তাঁহার সন্তান হইয়া বাঁচিত না, সেইজন্য শিশুকাল তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'গুহিয়া', যাহাতে যম তাহাকে অপবিত্র বিবেচনা করিয়া স্পর্শ করিতে না পারে। তিনি লিখিয়াছেন, 'জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে'। চৈতন্যদেব তাঁহার পিতৃগৃহে

আসিলে তাঁহার জননী তাহাকে কোলে করিয়া তাঁহার জন্য রন্ধন করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্তটি তিনি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,

বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র একগ্রাম বটে,
আমাইপুরী তার নাম।
তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞিব পূর্বশিষ্য
তার ঘরে করিয়া বিশ্রাম॥
তাহার নন্দন গুআ জয়ানন্দ নাম থুঞা
রোদনী রান্ধিল তারে লঞা॥
রোদনী ভোজন করি চলিলা নদীয়া পুরী
বায়ড়ায় উত্তরিল গিঞা॥

অর্থাৎ রোদনীর রান্না আহার করিয়া চৈতন্যদেব নদীয়াপুরীতে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

চৈতন্যদেবের জীবনীকে নয়খণ্ডে ভাগ করিয়া জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করিয়াছেন। খণ্ডগুলি যথাক্রমে এই---আদিখণ্ড, নদীয়াখণ্ড, বৈরাগ্যখণ্ড, সন্ন্যাসখণ্ড, উৎকলখণ্ড, প্রকাশখণ্ড, তীর্থখণ্ড, বিজয়খণ্ড, এবং উত্তরখণ্ড। জয়ানন্দের রচনা পারিপাট্যহীন, বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পর শিথিল ভাবে সংলগ্ন ভাবাবেগ এবং গীতিরসের স্পর্শহীন। অর্থাৎ যে সকল, গুণ থাকিলে রচনা আকর্ষণীয় হইতে পারে, জয়ানন্দের রচনায় তাহাদের অধিকাংশেরই অভাব ছিল, সেইজন্য তাহা ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার রচনায় বিশেষ সমাদর হইয়াছিল, তাহাও বলিতে পারা যায় না। তাঁহার রচিত 'চৈতন্য-মঙ্গলের সবগুলি পুঁথিই প্রায় একই স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহা বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর অঞ্চল মাত্র।

৩। চৈতন্যমঙ্গল-লোচন দাস

চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য কবির নাম লোচন দাস, ইহার প্রকৃত নাম ত্রিলোচন দাস, লোচন দাস নামেই তিনি বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত। বর্ধমান জিলার কোগ্রামে আনুমানিক ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন, 'বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস।' তারপর মাতাপিতার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

মাতা সতী শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা॥

অর্থাৎ তিনি নরহরি দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নরহরি দাস বৈষ্ণব সমাজে নরহরি ঠাকুর নামে পরিচিত। তাঁহার সাধন ভজনের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল, লোচন দাস তাহাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য গোঁড়া চৈতন্য-ভক্তদিগের সঙ্গে তাঁহার যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল না।

লোচন দাস তাঁহার আত্মপরিচয়ে আরও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার 'মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রাম।' অর্থাৎ একই গ্রামে তাঁহার মাতুলালয় এবং পিত্রালয়। তারপরও তিনি লিখিয়াছেন যে 'মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।' অর্থাৎ মাতৃকুলে এবং পিতৃবংশে তিনি একমাত্র সন্তান ছিলেন। এমন সন্তানের লেখাপড়া হওয়া কঠিন, কারণ, শৈশবে শাসন করিবার কেহ না থাকিলে শিশুর শিক্ষা হইতে

পারে না। উভয়কুলে একমাত্র সন্তান হইবার জন্য তাঁহার শৈশব হইতেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিল।

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
যথা যাই তথাই দুলিল করে মোরে।
দুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥

তাঁহারা মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত। মনে হয়, লোচন তাঁহার অপুত্রক জীবনে একমাত্র দৌহিত্র হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁহার নিকট স্নেহের প্রশ্রয় পাইবার পরিবর্তে শাসন লাভ করিয়াছিল, কারণ, তিনি লিখিয়াছেন, 'মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর।'

অধিক বয়সে তিনি অক্ষর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বছর বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর তিনি তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও তিনি আরও দুইখানি সুবৃহৎ আকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, একটির নাম 'দুর্লভ সার' আর একটির নাম 'আনন্দলতিকা'। তিনি বহু বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা। তবে চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে রচিত 'চৈতন্যমঙ্গলই' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। আনুমানিক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন।

চৈতন্যদেবের জীবিত কালেই চৈতন্যদেব সম্পর্কিত নানা অলৌকিক ঘটনা লোকমুখে প্রচারিত হইতে থাকে। তাঁহার তিরোধানের পর সেই সকল কাহিনী আরও পল্লবিত হইয়া শত শত মুখে শত শত রূপ ধারণ করে। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর যখন তাঁহার জীবন সম্পর্কে নানা অলৌকিক বিশ্বাস বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র প্রচার লাভ করিতেছিল, সেই যুগে লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাও নানা অলৌকিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বিশেষতঃ লোচনদাস উচ্চ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবি ছিলেন, তাঁহার পদাবলীর ভাষা মধুর গীতিরসাক্রান্ত। সুতরাং তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া বহুলাংশে কল্পনা ও কাব্যের পথ ধরিয়াছেন, সেইজন্য চৈতন্যজীবনীর ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া ইহার দৈন্য স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু লোচনের জনপ্রিয়তা তাহার জন্য নহে, বরং তাঁহার রচনার লালিত্য ও প্রসাদগুণের জন্য। সেই দিন চৈতন্যজীবনীর মধ্যে কেহ ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান করিত না, কাব্যরসেরই সন্ধান করিত, লোচন দাস তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তাহার পাঠকের মন সেই রসে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্য দিয়া সেই রসের প্রবাহকে তিনি ব্যাহত করিয়া দিতে চাহেন নাই। নিমাই সন্ন্যাসের বৃত্তান্তটি তাঁহার রচনায় যতখানি করুণ এবং প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে, ততখানি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ হয়ত হয় নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা বিদরিয়া যায় হিয়া
আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥

ধিক রহুঁ মোর দেহে এক নিবেদন তোঁহে
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
গহন কন্টক বনে কোথা যাবে কার সনে
কেবা যাবে তব সাথে সাথে॥
শিরীষ কুসুম যেন কোমল চরণ তেন,
পরশিতে মনে লাগে ভয়।
ভূমেতে দাঁড়াও যবে প্রাণ মোর লও তবে
হেলিয়া পড় এ পাছে গাএ।

ইহা ইতিহাস নহে, ইহা কাব্য; ইহাতে তথ্য নাই, কল্পনা আছে, ইহাতে সত্য নাই, রস আছে, লোচন দাসের ইহাই বিশেষত্ব।

চৈতন্যদেবকে সন্ন্যাসের পথে বিদায় দিবার সময় ভক্তগণ যে বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লোচন দাসের রচনায় করুন এবং মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে—

কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস॥
একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে॥
শচীর দুলাল তুমি দুলীল চরিত।
দু'খানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥
ভক্তজন নয়ন-অমিয়া-দিঠি-পাতে।
এ দেহ প্রেমার তরু বাঢ়ে হাথে হাথে॥
অনেক আছিল প্রেমফল-প্রতিআশে।
সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইলে আশে॥
পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া।
ঘরে চলি যায় তোরে, বিদায় করিয়া॥

শচীমাতাকে দেখাইয়া ভক্তগণ তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
সহিতে না পারি উহার বিনানিঞা বাণী॥

এই দেখ তোমার জননী শচী দেবী, তাঁহার করুণ বেদনার্ত বাণী আমরা সহ্য করিতে পারি না। তারপর বিষ্ণুপ্রিয়া,

বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনেতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর বাজারে॥

চৈতন্যদেবের জীবন কেবল মাত্র যে তথ্য এবং তত্ত্বভারাক্রান্ত নয়, ইহার মধ্যে যে প্রকৃত পার্থিব জীবনরসেরও উপাদান ছিল, লোচন দাসের রচনা তাহা যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, আর কাহারও চরিতকাব্য তাহা পারে নাই। সেইজন্য লোচন দাসের রচনার মত মধুর আর কাহারও রচনা নহে; জীবনরসের স্পর্শ হইতেই এই মাধুর্যের জন্ম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে লোচন দাস যে বৃত্তান্তটির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও অভিনব; তাহা কবি-কল্পনার ফল কিংবা দৈববিশ্বাসসম্মত হইতে পারে, কিন্তু সত্যের জগতে ইহার মূল্য নাই। তিনি লিখিয়াছেন, চৈতন্যদেব একদিন জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। সেদিন আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথি। তিনি মন্দিরের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলেন,

নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়
সেইক্ষণে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায় ।।
তখন দুয়ারে নিজ লাগিলা কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ।।
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে ।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্তন সার ।।
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগে আইল এই দেহত শরণ।
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ।।
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথ-লীন প্রভু হৈলা আপনে ।।

অর্থাৎ তিনি বাহু মেলিয়া জগন্নাথ বিগ্রহকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং এই ভাবেই জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে লীন হইয়া গেলেন,কেহ তাঁহার আর দেখা পাইল না। পুরীর গুণ্ডিচা বাড়ীতে যখন একজন পাণ্ডা চৈতন্যদেবকে জগন্নাথ বিগ্রহ এইভাবে আলিঙ্গন করিতে দেখিল, তখন সে'কর কি কর কি' বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল। চৈতন্যের ভক্তগণ কপাটের বাহিরে ছিল, তাহারা পাণ্ডাকে কপাট খুলিতে বলিল,

বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট, প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা।
ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয় তখন
গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ।।

কপাট খুলিলে শ্রীচৈতন্যকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কতখানি ইতিহাস আছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধানের বৃত্তান্ত এই ভাবে আর কেহ বর্ণনা করেন নাই। অবশ্য কেহ কেহ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' বিখ্যাত নহে, বরং কবিত্বের জন্য ইহা জনপ্রিয়। চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনটিকে তিনি একটি গীতিকবিতার সুরে গাঁথিয়া দিয়াছেন, গীতিপ্রিয় বাঙ্গালী তাঁহার মধ্যে গীতিরসের আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

লোচন দাস চৈতন্যজীবনের কাহিনী তাঁহার গুরু নরহরি দাসের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার চরিতকাব্য রচনা করিলেও মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কড়চাখানিও তাঁহার অবলম্বন ছিল। তিনি সামান্য ঘটনাকে কবি-কল্পনায় সহজেই পল্লবিত করিতে জানিতেন, তাহার ফলে মুরারি গুপ্তের কড়চার সংক্ষিপ্ত বিবরণীকে তিনি অনেকক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া লইয়া নিজের রচনার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিজের কল্পনা-প্রসূত বহু কাহিনী আনিয়া যুক্ত করিয়াছেন। 'চৈতন্যমঙ্গল' চৈতন্যজীবনী হইলেও লোচনদাসের মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী ইহাতে গণেশ বন্দনা, হরগৌরী ও সরস্বতী বন্দনা ইত্যাদি যোগ করিয়াছেন, অন্য কোন বৈষ্ণব চরিতকার তাহা করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, 'চৈতন্যমঙ্গল' নামটিও তিনি চণ্ডীমঙ্গল,

মনসামঙ্গল ও মঙ্গলকাব্যের এই সকল ন্যাম হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনাটি চারিখণ্ডে বিভক্ত—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড। নিজের রচনা সম্পর্কে তিনি মুরারি গুপ্তের নিকট ঋণ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 'সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়'। তিনি শ্লোক বন্ধে গৌরাঙ্গ-চরিত পুঁথি রচনা করিয়াছেন,

শুনিঞা আমার মনে বাড়িল পীরিতি ॥
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত।

নিজের গুরু নরহরি দাসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

তাহার প্রসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচন দাস ॥

তারপরও নিজে বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,

যে কিছু কহিল নিজে বুদ্ধি অনুরূপ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মুরুখ ॥

মুরারি গুপ্ত, নিজের গুরু, তারপরও নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা নিজেই এইভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ত্যাগ ও বৈরাগ্য চৈতন্যজীবনের আদর্শ ছিল। সংসার-জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাদের পথে অগ্রসর হইয়া যাইবার মধ্যে যে কারুণ্য ও বেদনার ভাব ছিল, লোচন দাস তাঁহার কাব্যের মধ্যে দিয়া তাহার সার্থক রূপ দান করিয়াছেন। তিনি শুধু তথ্য কিংবা তত্ত্ব পরিবেশন করেন নাই। এক একজন কবি চৈতন্য-জীবনীকে এক এক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিয়াছেন—কেহ তথ্যের দিক হইতে, কেহ তত্ত্বের দিক হইতে, কেহ কেবল মাত্র কাব্যের দিক হইতে। একের অভাব অন্যে পূর্ণ করিয়াছেন। সকলের রচনার মধ্য দিয়া চৈতন্যজীবনী পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। লোচন দাস চৈতন্যজীবনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনি ইতিহাসও রচনা করেন নাই কিংবা দর্শনও রচনা করিতে চাহেন নাই। সুতরাং সেই দিক হইতেই তাঁহার রচনার বিচার করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

৪। চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস

চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করিয়া রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত'; ইহার রচয়িতার নাম বৃন্দাবন দাস। কথিত হয় যে কবি গ্রন্থ খানির নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ই রাখিয়াছিলেন, কিন্তু লোচন দাসের 'চৈতন্য-মঙ্গলে'র সঙ্গে ইহার একই নাম লইয়া গোলযোগ হইতে পারে ভাবিয়া বৃন্দাবন দাস তাঁহার জননী নারায়ণীর অনুরোধে ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'চৈতন্য ভাগবত' নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই জনশ্রুতি সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বৃন্দাবন দাস ইহাতে চৈতন্যদেবের জীবন বিশেষতঃ তাঁহার বাল্যজীবন ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের আদর্শে রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যজীবনী রচনা কালে বৃন্দাবনদাসের ভাগবত গ্রন্থ খানিই আদর্শ ছিল, সেইজন্য তিনি নিজে প্রথম হইতেই তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত' রাখিয়াছিলেন, এই বিষয়ে লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই সম্পর্কে পরবর্তী কালে রচিত 'প্রেমবিলাস' নামক একটি গ্রন্থে যে লেখা হইয়াছে,—

চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥

এই উক্তিও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এইভাবে কোনও গ্রন্থের কবির নিজের প্রদত্ত কোনও নাম পরিবর্তন করিয়া অন্য কেহ কোনও নামকরণ করিবার দৃষ্টান্ত প্রাচীন কিংবা আধুনিক সাহিত্যের কোনও ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে যে 'প্রেমবিলাস 'গ্রন্থ টির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার অনেক তথ্য অনৈতিহাসিক। ইহাকে আনুপূর্বিক প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্বে নবদ্বীপে বাসকালীন গৌরাঙ্গদেব যে শ্রীবাসের আঙ্গিনাতে প্রত্যহ সারারাত্রি ব্যাপিয়া কীর্তন করিতেন, সেই শ্রীবাসের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন,—তাঁহাদের এক জনের নাম শ্রীরাম, শ্রীরামের কন্যার নাম নারায়ণী, নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস। তাঁহার পিতৃনাম জানিতে পারা যায় না।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক অর্থাৎ ১৫১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অল্প বয়সেই তিনি নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ, চৈতন্যদেব তখন পুরীতে বাস করিতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে চৈতন্যদেবের কীর্তনের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বার বার এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন,

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥

তখন তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার জননী নারায়ণীর বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র। তিনি চৈতন্যদেবের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, একদিন শ্রীবাস গৃহে কীর্তন করিবার কালে,

সম্মুখে দেখয়ে একা বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী॥
সর্বভূত অন্তর্যামী প্রভু গৌরচান্দ।
আজ্ঞা কৈলা, 'নারায়ণি, কৃষ্ণ বলি কান্দ'॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে নাহিক সংবিত॥

নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস অল্প বয়সেই চৈতন্য-পার্ষদ নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তিনি বর্ধমান জিলার দেনুড় গ্রামে বাস করিতে থাকেন, সারা জীবন বিবাহ করেন নাই। তিনি নিত্যানন্দের আদেশেই চৈতন্যচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হন বলিয়া বার বার উল্লেখ করিয়াছেন,

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

নিত্যানন্দের নিকট হইতেই তিনি চৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার উপরই তিনি প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিলেও এই সম্পর্কে অন্যান্য ভক্তেরও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্যও অন্যতম। কোনও কোনও প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।' তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার নিজের জননীর নিকটও চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ বাসকালীন জীবনের কথা

জানিয়া থাকিতে পারেন। সুতরাং তিনি যে নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, সেই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

পরবর্তী চৈতন্য চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
সূত্র করি যেই লীলা করিলা বর্ণন।

সুতরাং চৈতন্য-জীবনী রচনায় পরবর্তী সকল লেখকই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটিকেই আকর-গ্রন্থ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি চৈতন্যজীবনী রূপে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। বিশেষতঃ নিত্যানন্দের শিষ্য তাঁহার রচিত চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের সম্পর্কেও অনেক সময় বিস্তৃত কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ফলে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও চৈতন্যদেব সম্পর্কে অনেক বিষয়ই ইহাতে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। 'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যদেবের শেষ-জীবনের কথা নাই। চৈতন্যদেবের জীবন-কথা লিখিবার শেষ অংশে আসিয়া বৃন্দাবন দাসের নিত্যানন্দ-লীলার কথা স্বতন্ত্র আকারে নূতন একটি কাব্যের মধ্যে দিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইল, তিনি চৈতন্যের জীবনী রচনা অসম্পূর্ণ রাখিয়া নিত্যানন্দের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তথাপি 'চৈতন্যভাগবত' একটি সুবিশাল গ্রন্থ। ইহার মধ্যে চরিত্র সৃষ্টিতে বিষয়-বর্ণনায় মহাকাব্যের বিশালতা আছে। বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্য-ভাগবতে' চৈতন্য-জীবনীর মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ইষ্টদেব নিত্যানন্দের আবেশে আবিষ্ট হইবার ফলে সেই মহাকাব্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য, তথাপি যতটুকু তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার ততটুকুর মধ্যেই মহাকাব্যের স্বাদ পাওয়া যায়। তাঁহার মধ্যে যে সুগভীর ভাবাবেশ ছিল, তাহাতেই তাঁহার রচনার কাব্যগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার মধ্যে যে স্বভাব-কবিত্ব ছিল, তাহার গুণে তাঁহার রচনা সহজ, সাবলীল এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলা হয়, ইহা তাঁহার পক্ষে যথাযথ।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' তিন খণ্ডে বিভক্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদিখণ্ডে দ্বাদশটি অধ্যায়, তাহাতে গৌরাঙ্গ জন্ম হইতে তাঁহার গয়াভূমি গমন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, মধ্যখণ্ডে ছাব্বিশটি অধ্যায়, তাহাতে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও চৈতন্য-জীবনীর এই পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনার মধ্যে নিত্যানন্দের প্রসঙ্গ একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, তথাপি অন্ত্যখণ্ডে কেবল মাত্র একাদশটি অধ্যায় রচনা করিয়া বৃন্দাবন দাস চৈতন্যজীবনী অসম্পূর্ণ রাখিয়া নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনায় মনোনিবেশ করিয়া-ছিলেন। অন্ত্যখণ্ডে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র বর্ণনা পর্যন্ত চৈতন্য-জীবনী শেষ হইয়া গিয়াছে। জীবনী রচনায় যে জীবনটি মূল অবলম্বন, তাঁহার তিরো-ভাব পর্যন্ত বর্ণনার যে একটি দায়িত্ব আছে, বৃন্দাবন দাস তাহা পালন করেন নাই।

তথাপি চৈতন্য-জীবনীর যতখানি বৃন্দাবন দাস রচনা করিয়াছেন, ততখানিই তাঁহার কবিত্ব এবং রচনার গুণে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মধ্যে কোথাও কোনও অস্পষ্টতা নাই।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, সেই 'শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে'র দশম স্কন্ধের অনুযায়ী করিয়া চৈতন্যদেবের বাল্যলীলাও বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্য-

জীবনীর এই অংশ তিনি বহু অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ করিয়াছেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্র শিশু গৌরাঙ্গের পদচিহ্নে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিয়া শচীমাতাকে ডাকিয়া তাহা দেখাইলেন, অতিথি ব্রাহ্মণকে একদিন তাঁহার দিব্যশক্তি দেখাইলেন, শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র যশোদা ও নন্দের অনুরূপ আচরণ করিতেন। এমন কি, জননী যশোদা শিশু কৃষ্ণকে যে ভাবে শাসন করিতেন, সেই ভাবেই জগন্নাথ মিশ্রও ক্রুদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে পুত্রকে শাসন করিতেন। আদিখণ্ড অংশ সাধারণ ভাবে অলৌকিকতা-ভারাক্রান্ত রচনা বলিয়া মনে হইবে।

মধ্যখণ্ডে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদনার ভাবটি বৃন্দাবন দাস সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোনও কোনও অংশে অলৌকিকতা থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনানুভূতিরও সার্থক পরিচয় আছে। দরিদ্র শ্রীধরের কৃষ্ণভক্তি, পুত্রশোকাহত শ্রীবাসের চৈতন্য ভক্তি ইত্যাদি কাহিনীর মধ্যে জীবন এবং আদর্শের সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। অন্ত্যখণ্ড অসম্পূর্ণ হইলেও ইহাতে চৈতন্যজীবনের ত্যাগ-বৈরাগ্যের একটি নূতন আদর্শ প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হইয়াছে, তাহা জীবন-কাহিনীটিকে যে পবিত্র এবং নির্মল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভূত হয়।

'চৈতন্যভাগবত' খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস। ইহাতে চৈতন্য-জীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চায় দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু সেই বিদ্যাচর্চা নিছক জ্ঞানচর্চা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কারণ, তাহাতে ভক্তির কোনও স্পর্শ ছিল না, 'কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।' চারিদিকে অনাচার মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মণ-সন্তান জগাই মাধাই মদ্যপান করিয়া সমাজের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া চলিতেছিল, নবদ্বীপে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। নবদ্বীপের কাজী যথেচ্ছ আচরণ করিতেন। ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী রাত্রি জাগিয়া হরিসঙ্কীর্তন করিত, কাজী তাহাদের সঙ্কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। অবিশ্বাসী বা পাষণ্ডীরাও বৈষ্ণবদিগকে নানাভাবে উপদ্রব করিত, আর্যাতর্জা পড়ে যত বৈষ্ণব দেখিয়া।' অর্থাৎ বৈষ্ণব দেখিতে পাইলেই তাহা-দিগের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ছড়া বলিয়া অপমানসূচক আচরণ করে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অদ্বৈতাচার্য দিবানিশি কৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া জগৎকে এই অনাচার হইতে পরিত্রাণ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, এই অবস্থার মধ্যেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল।

'চৈতন্যভাগবত' পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বৃন্দাবন দাসের সময় বৈষ্ণব সমাজও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, চৈতন্য, গদাধর ইহারা প্রত্যেকেই তখন পৃথক্ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া-ছেন। ইহারা পরস্পরের মধ্যে কলহ করিতেন। নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের মধ্যে মতানৈক্য ছিল, অনেক সময় প্রকাশ্য কলহ হইত। বৃন্দাবন দাস এই সকল কলহকে দৈবলীলা অথবা 'প্রেমকলহ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

কলহের ভাষা এবং আচার আচরণের মধ্য দিয়া সংযম এবং শালীনতার সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত। অর্থাৎ বৃন্দাবন দাস কোনও কিছুই গোপন করিতে জানিতেন না, এমন কি, তাঁহার ইষ্টগুরু নিত্যানন্দ সম্পর্কেও নয়। সব কিছু

প্রত্যক্ষ ভাবে লিখিতে ভালবাসিতেন। নিত্যানন্দ অবধূত এবং অদ্বৈতাচার্যের কলহের বর্ণনাটি জীবন্ত এবং বাস্তব—

অদ্বৈত বোলয়ে 'অবধূত মাতালিয়া।
এথা কোন জন তোকে আনিল ডাকিয়া॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্তাইলি কেনে।
সন্ন্যাসী করিয়া তোরে বলে কোন জনে॥
হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।
জাতি আছে হেন কোন্‌জনে বোলে তোরে॥
বৈষ্ণব সভায় কেনে মহামাতোয়াল।
ঝাট নাহি পলাইলে নাহিবেক ভাল॥'
নিত্যানন্দ বোলে, 'আরে নাঢ়া, বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ পাছে দেখাও প্রতাপ॥
আরে বুড়ো বামনা, তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত মত্ত ঠাকুরের ভাই।
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥
আমি মারিলেও তুমি বলিতে না পার।
আমা সনে অকারণে তুমি গর্ব কর॥'
শুনিঞা অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হৈয়া অশেষ মন্দ বোলে।

বৃন্দাবন দাসের ভাষায় সর্বত্রই এই প্রত্যক্ষতার গুণ আছে।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর শচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে দুঃখের কথা বিস্তৃত করিয়া লিখিতে তাঁহার দুঃখ হয়, সেইজন্য সেই অংশ তিনি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শচীমাতার বেদনাহত চিত্রটি তিনি সংক্ষেপে এইভাবে মাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন—'পৃথিবী স্বরূপা হইলা শচী জগন্মাতা।' ইহার অতিরিক্ত তাঁহার সম্পর্কে আর কিছুই লেখেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার কাব্যের উপেক্ষিতা চরিত্র।

বৃন্দাবন দাসের মহাকাব্য রচনার যে প্রতিভা ছিল, তাহা তাঁহার একটি বিষয়ের এক সুবিশাল বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাহা চৈতন্যদেবের কাজীদলনের বর্ণনা। এক বিশাল সঙ্কীর্তনের দল গঠন করিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দের নেতৃত্বে কাজীকে শাসন করিবরার জন্য তাঁহারা গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া কাজীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এই বিশাল সঙ্কীর্তন দলটির বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস তাঁহার যে বিশাল কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার যথার্থই মহাকাব্য রচনার শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি বৃন্দাবন দাসের মনে যথোচিত বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের ভাব ছিল না, এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। কারণ, তাঁহার কাব্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার ইষ্টদেবতা নিত্যানন্দকে সমাজে অনেকেই নিন্দা করিত। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের গুণরাশি কীর্তন করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এত গুণ থাকা সত্ত্বেও যে লোকে নিত্যানন্দকে নিন্দা করে, সেজন্য তিনি নিন্দকদের মাথায় লাথি মারিবার কথা বলিয়াছেন,

এত পরিহরেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥

বৃন্দাবন দাস কবি ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাত্ত্বিক ছিলেন না, কিংবা দার্শনিকও ছিলেন না, সেইজন্য বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার তাঁহার গ্রন্থে নাই। তত্ত্ব কথা বিশ্লেষণের পথে তিনি আদৌ অগ্রসর হন নাই, সুনিপুণ দ্রষ্টার মত সমাজের কথা, মানুষের কথা, তাহার সম্প্রদায়ের কথা এমন কি তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের ভিতরকার কলহ বিবাদের কথা তিনি কিছুই গোপন রাখেন নাই, এই বিষয়ে তাঁহার যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা তাঁহার রচনাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি, তাঁহার ইষ্টদেবতাকে যে অদ্বৈতাচার্য মাতাল বলিয়া সর্বদা গালাগালি করিতেন, তাহাও তিনি গোপন করেন নাই, কদাচ মানুষের দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন করিয়া তিনি কেবল মাত্র আদর্শের মহিমা কীর্তন করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার কাব্যখানি ধর্মকথায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহা কাব্য পাঠকের কাছে আনন্দ-দায়ক বলিয়া মনে হয়।

বৃন্দাবন দাস যেভাবে নিত্যানন্দের আদেশ শিরোধার্য করিয়া চৈতন্য-জীবনী রচনা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইভাবে কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার ধারা রক্ষা করিতে পারেন নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-জীবনের কথা তাহাতে অসম্পূর্ণ। অথচ তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনই তাঁহার জীবনের অর্ধেক কাল জুড়িয়া ছিল। ইহা দেশবিদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহাতে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা নাই, তাঁহার রহস্যময় অন্তর্ধানেরও কোনও ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই।

তথাপি চৈতন্যধর্মের মূল আদর্শটি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' যত সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোনও গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই। কারণ, যে হৃদয়াবেগের উপর চৈতন্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বৃন্দাবন দাস ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়া নিজেও সেই হৃদয়াবেগের অধিকারী ছিলেন। সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম-ভাবনা তাঁহার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সহজ যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের নিজের মধ্যেও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি এবং বিশ্বাস গভীরতর ছিল। সুতরাং ভক্তি এবং বিশ্বাসের উপর যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা তাহা কেবল মাত্র তাঁহার বহির্মুখী আচরণীয় ধর্ম ছিল না, তাহা তাঁহার হৃদয়ের ধর্মও ছিল। সেই জন্য ভক্তি ও ভক্তের কথায় তাঁহার বর্ণনায় স্বভাবতঃই যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাহা পায় নাই।

শ্রীবাসের চৈতন্যের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের একটি অসাধারণ কাহিনী বৃন্দাবন দাসের সুগভীর আন্তরিকতা পূর্ণ রচনার গুণে মর্মস্পর্শী হইয়া আছে। কাহিনীটি এখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীবাসের গৃহে প্রতি রাত্রে ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্তন-নৃত্য করিয়া থাকেন। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও গভীর রাত্রে নৃত্য আরম্ভ হইল। মহাপ্রভু আত্মবিস্মৃত হইয়া কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহু তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এমন সময় শ্রীবাসের গৃহের অন্তঃপুরে শ্রীবাসের চারি বৎসরের একটি পুত্রের মৃত্যু হইল। অন্তঃপুর হইতে নারীকন্ঠে বিলাপের শব্দ শুনিতে পাইয়া শ্রীবাস ছুটিয়া অন্তঃপুরে আসিলেন, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নারীদিগকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

তোমরা ত সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সংবর ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যাঁর নাম।
মহাপাতকীও চলি যায় কৃষ্ণধাম॥

হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মা আদি ভৃত্য॥
এ সময়ে যাহার হইবে পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক॥
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এই ভক্তি এবং বিশ্বাস লইয়া শ্রীবাস পুত্রশোক ভুলিয়াছেন; কিন্তু অন্তঃপুরের নারীদিগের শোকাহত হৃদয় বুঝি তাহার এই প্রবোধ মানিতে চাহিল না। তাই শ্রীবাস তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,

যদি বা সংসার ধর্ম নার সংবরিতে।
বিলম্বে কান্দহ যার যেন লয় চিতে॥

যদি তোমরা সংসার ধর্ম অনুসারে শোক সংবরণ করিতে না পার, তবে তোমাদের নিকট আমার অনুরোধ তোমরা কিছুক্ষণ পরে কাঁদিও, এখন নীরব হইয়া থাক; কারণ,

অন্য যেন কেহ আর এ আখ্যান না শুনয়।
পাছে ঠাকুরের নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়।
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্বথায়॥

তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, এই মৃত্যু সংবাদ যেন আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ না করে। যদি তাহাতে প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, কলরব শুনিয়া যদি প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে, তবে তোমাদিগকে আমি বলিয়া রাখিতেছি, আমি নিশ্চিতই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিব, ইহার অন্যথা হইবে না।

শুনিয়া নারীগণ ভয়ে নীরব হইল। শ্রীবাস আবার আসিয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্কীর্তনে যোগ দিলেন।

পরানন্দে সঙ্কীর্তন করল শ্রীবাস।
পুনঃপুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পর্ষদের ওই গুণ সীমা॥

তারপর কীর্তনে যখন বিরাম হইল, তখন ভক্তগণ পরম্পরায় এই দুঃসংবাদ শুনিতে পাইল। 'তথাপিহ কেহো কিছু ব্যক্ত নাহি করে।' প্রভুর মনে একটা কিছু সন্দেহ হইল। তিনি শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ আমার মন কেন অস্থির বোধ হইতেছে? শ্রীবাস, তোমার গৃহে কি কিছু অমঙ্গল হইয়াছে?' তথাপি শ্রীবাস বলিলেন,

পণ্ডিত বোলয়ে প্রভু মোর কোন দুখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥

ক্রমে তিনি সব বৃত্তান্তই শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া

সম্ভ্রমে বোলয়ে প্রভু কহ কতক্ষণ।
শুনিলেন, চারিদণ্ড রজনী যখন।
তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ কার্য করিতে সত্বর॥

শ্রীবাসের এই অসাধারণ আচরণের কথা শুনিয়া প্রভু ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর মনে কি ভাবোদয় হইল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কথাই স্মরণ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন,

'প্রভু বোলে, হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমনে।'
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে।
পুত্রশোক না জানিলে যে মোহোর প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুই ছাড়িমু কেমনে॥

যে আমার প্রতি ভক্তি এবং বিশ্বাস বশতঃ পুত্রশোক পর্যন্ত অনুভব করিল না, তাহাকে আমি কেমনে ত্যাগ করিয়া যাইব? বলিয়া প্রভু অবিরাম অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অন্ত্যখণ্ড আকস্মিকভাবে শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, বৃন্দাবন দাস ইহা এই পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রাখিয়াই আকস্মিক ভাবেই পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ, পরবর্তী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা হইলে তাঁহার রচনায় এই কথা উল্লেখ করিতেন, কিন্তু তিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অন্য কথা; তিনি লিখিয়াছেন,

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হৈল বিস্তার।
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোনও লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।

যদি আকস্মিক ভাবে দেহত্যাগের জন্য বৃন্দাবন দাস তাঁহার রচনা অসম্পূর্ণ রাখিতেন, তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা উল্লেখ করিতেন। বিশেষতঃ 'চৈতন্য-ভাগবতের' শেষাংশ হইতে ক্রমেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে বৃন্দাবন দাসের অনুরাগ ক্রমে নিত্যানন্দের প্রতি গাঢ়তর হইতেছে, কয়েকটি আনুপূর্বিক অধ্যায় তিনি চৈতন্য নিঃসম্পর্কিত ভাবেই কেবলমাত্র নিত্যানন্দকে অবলম্বন করিয়াই রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে চৈতন্য-জীবনী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজস্ব ইষ্টদেবতার জীবনী রচনা করিবার প্রেরণা অধিকতর সক্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। চৈতন্যের কথা দিয়া বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত', রচনা আরম্ভ হইয়াছিল, নিত্যানন্দের কথা দিয়া তাহা শেষ হইয়াছে।

৫। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

সকলেই মনে করেন যে, চৈতন্য-জীবনী সম্পর্কিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।' ইহা কেবলমাত্র চৈতন্য-জীবনী নহে, ইহা চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দর্শন শাস্ত্র বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। কেবলমাত্র সে যুগে কেন এই যুগেও ইহার মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলাগ্রন্থ রচিত হয় নাই। ইহার একখানি সংস্কৃত টীকা পর্যন্ত রচিত হইয়াছিল। টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষ ভাগে তিনি এই বাংলা গ্রন্থের সংস্কৃত টীকাখানি রচনা করেন। এই পর্যন্ত আর কোনও বাংলা গ্রন্থের পক্ষে এই সৌভাগ্য হয় নাই।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনা কবে আরম্ভ হইয়া কবে শেষ হয়, এই বিষয়ে সকলে একমত নহেন। গ্রন্থটির শেষাংশে একটি সংস্কৃত শ্লোকে গ্রন্থ-রচনার সমাপ্তিকাল নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাঠদুষ্টি থাকার ফলে এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় না। তবে অধিকাংশেরই মতে ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থপাদের প্রথম ভাগ অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই গ্রন্থখানি রচনার সময় চৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁহার অনুমতি লইয়া এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তার আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ধমান জিলার ঝামটপুর গ্রামে আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভগীরথ গ্রামে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন, ইনি জাতিতে বৈদ্য। কৃষ্ণদাসের মাতার নাম সুনন্দা। শৈশবেই তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়, তিনি তখন তাঁহার কনিষ্ঠাকে লইয়া পিসিমাতার বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন, সেখানে নিতান্ত দুঃখে-কষ্টে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে। তাই শৈশব হইতেই কৃষ্ণদাস দুঃখকষ্টে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

কথিত হয় যে প্রায় প্রৌঢ় বয়সে কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়া বৈষ্ণব মহান্তদিগের অনুগ্রহ লাভ করেন। তিনি আজীবন কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের সাহায্যে তাঁহার সংসার-বন্ধনহীন জীবন কাটিতে থাকে। সেখানে তিনি রঘুনাথ দাসের শিষ্যত্ব লাভ করেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের সাহচর্যে তাঁহার বৈষ্ণব শাস্ত্রের অধ্যয়ন ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি নিজেও 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক কৃষ্ণভক্তিমূলক গ্রন্থ এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা' রচনা করিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হইলেন।

বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ প্রত্যহ পাঠ করিতেন। কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ, তাহাতে চৈতন্যদেবের শেষলীলার কোনও বর্ণনা না থাকিবার জন্য তাঁহারা ইহার ত্রুটি অনুভব করিতেন। তখন গোস্বামিগণ চৈতন্য-জীবনীর এই অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া তাঁহার একখানি নূতন চরিত-কাব্য রচনা করিবার জন্য সকলে কৃষ্ণদাস কবিরাজকেই অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি বয়সের দিক দিয়া প্রবীণ। তথাপি গোস্বামীদিগের আদেশ শিরোধার্য করিয়া এই দুরূহ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥

এই বিষয়ে তাঁহার শারীরিক অক্ষমতার কথা তিনি এইভাবে স্মরণ করিয়াছেন,

আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।

না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে
তভু লিখি এ' বড় বিস্ময়॥

বৈষ্ণব-চরিত্রের প্রধান গুণ বিনয়, বিনয় গুণে কৃষ্ণদাস কবিরাজের তুলনা নাই। সুতরাং এখানে তিনি তাঁহার শারীরিক এবং মানসিক অক্ষমতা সম্পর্কে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের বিনয়-গুণেরই ফল, নতুবা তাঁহার রচনার মধ্যে ইহার কোনও স্পর্শ অনুভব করা যায় না। তাঁহার 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা কিংবা ভাবনার দিক হইতে কোথাও শিথিল বলিয়া মনে হইবে না। সুতরাং এই গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহার মন সতেজ, সক্রিয় এবং স্মৃতিশক্তিও অশিথিল ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বয়সের কোনও ছাপ রচনার মধ্যে পড়ে নাই। সুতরাং মনে হয় প্রৌঢ় বয়সের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া পরিণত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লইয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে সাময়িক পীড়া সকলের পক্ষে সকল সময়েই সম্ভব।

তথাপি এই গ্রন্থ রচনায় কৃষ্ণদাসের সঙ্কোচের অবধি ছিল না, কারণ, বৃন্দাবন দাসের কীর্তি লোপ করিবার তাঁহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কেবলমাত্র গোস্বামীদিগের আদেশ পালন ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থ রচনার আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। সেইজন্য 'চৈতন্যভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের নিকট তিনি পদে পদে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন; এমন কি, মনে হয়, তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়াই তিনি তাহার গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে কথা আগে বলিয়াছি। বার বার তাঁহাকে 'চৈতন্য-লীলার ব্যাস' রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের জীবনী সম্পর্ক নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিবার পক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কতকগুলি সুযোগ ছিল, তিনি তাহাদের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথমতঃ চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ বাসকালীন জীবনের নির্ভরযোগ্য তথ্য তিনি বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ হইতে লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তারপর রঘুনাথদাসের মন্ত্রশিষ্য হইবার ফলে তিনি চৈতন্য-দেবের নীলাচল বা পুরী বাসকালীন আঠার বছরের জীবনের সমগ্র তথ্যও তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিবার পক্ষে তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র এবং বৈষ্ণব দর্শন---বা ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবারও তাঁহার পূর্ণ সুযোগ হইয়াছিল, কারণ, তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের অনুগ্রহ এবং নিত্যসান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র রচয়িতা বৃন্দাবন এই সকল অনেক সুযোগই লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং চৈতন্যজীবনী বিষয়ে তাঁহার রচিত এই গ্রন্থখানিকে কৃষ্ণদাস নানা বিষয়েই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে চৈতন্য-জীবনীর আনুপূর্বিক কাহিনী যেমন বর্ণনা করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তেমনই চৈতন্য ধর্মের ভাবাদর্শ ও আধ্যাত্মিক দর্শন সম্পর্কেও সম্যক আলোচনা প্রকাশ করিবার পক্ষেও সুযোগ ছিল। বিশেষতঃ গ্রন্থকার স্বয়ং ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, জীবনের উচ্চ নৈতিক আদর্শ তাঁহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া চৈতন্যধর্মের উচ্চনীতিমূলক নিগূঢ় তত্ত্বও তিনি সহজেই উপলব্ধি এবং প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাসের রচনা বাংলাদেশের মাটির দোষগুণমিশ্রিত, সেখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত কলহ, ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বন্দ্ব কিংবা নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা বৃন্দাবনের মাটিতে ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। এক মুক্ত, উদার পরিবেশের মধ্যে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কেনও

দিক হইতেই কোনও অসহিষ্ণুতার ভাব ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার নির্মল পরিবেশটিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি কেবল মাত্র তত্ত্বকথার নীরস আলোচনা কিংবা দর্শন শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারের কথা দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহা মধ্যে মধ্যে চৈতন্যজীবনীর এমন সকল ঘটনাতেও পরিপূর্ণ, যাহা সহজ মানবিক অনুভূতির স্পর্শে সুকোমল। এখানে তাহাদেরই দুই একটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত" রচনায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর শচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার বিশেষ কোন সংবাদ দেন নাই; কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র একটি বর্ণনায় দেখা যায়, সন্ন্যাস জীবনেও চৈতন্যদেব মাতা এবং পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাহা যথাসম্ভব পালন করিয়াছিলেন। ইহার অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের একটি ঘটনার বর্ণনা এইরূপ—

এক পিতৃহীন ওড়িয়া ব্রাহ্মণ বালক পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট নিত্য যাতায়াত করিত। মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা। চৈতন্যদেবও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সংসারে বালকটির বিধবা মাতা ছাড়া আর কেহ ছিল না। মহাপ্রভুর স্নেহ লাভ করিয়া সে তাঁহার নিকটই সর্বদা ছুটিয়া আসিত। মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত দামোদর (স্বরূপ দামোদর নহেন) ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না।

বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণ কুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাহা প্রীতি তাহা আইসে বালকের রীত॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে॥

তারপর আর একদিন যখন সেই বালক প্রভুর নিকট আসিল, তখন দামোদর স্থির করিলেন যে আজ বালক চলিয়া গেলে প্রভুকেই এই ব্যাপারে সাবধান করিয়া দিবেন। তারপর বালক যখন চলিয়া গেল তখন দামোদর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুর প্রতি ক্রোধ গোপন করিয়া বলিলেন, তুমি নিজে যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর, লোকে তোমাকে মুখের সম্মুখে কিছু বলিতে সাহস পায় না, কিন্তু কতদিন আর লোকের মুখ ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে? এইবার প্রভুর গুণযশ লোকে প্রচার করিতে আরম্ভ করিবে।'

মহাপ্রভু বিস্মিত হইয়া দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বলিতে চাও?'

দামোদর বলিলেন, এক বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রকে যে তুমি স্নেহ কর, তাহা কি ভাল দেখায়?

যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকের কানাকানি বাতে দেহ অবসর?

লোকে যে কানাকানি করে, তাহা কি কান পাতিয়া শোন?

দামোদরের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু মনে মনে খুসী হইলেন। মনে মনে স্থির বুঝিতে পারিলেন নবদ্বীপে তাঁহার পত্নী ও জননীর নিকট থাকিয়া তাঁহাদের

রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যক্তি দামোদর। কারণ, তাঁহাকেও যখন তিনি শাসন করিতে পারেন, তখন তাঁহার অভিভাবকত্বে থাকিলে তাঁহার পত্নী ও জননী সম্পর্কে চিন্তার আর কিছুই নাই। এই ভাবিয়া একদিন দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন—

প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা॥
তোমা বিনে তাহার রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে।
নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয়॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে॥

তোমার সম্মুখে কেহ স্বেচ্ছাচারিতা করিতে পারিবে না। এখানে মুখ্যত মহাপ্রভু মাতার কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বক্তব্যের মূল লক্ষ্য আর একজন, তিনি তাঁহার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া। সন্ন্যাসী চৈতন্য তাঁহার কথা মুখে আনিতে পারিলেন না সত্য, তথাপি সন্ন্যাস-জীবনেও তাঁহার কর্তব্য বিস্মৃত হইলেন না।

এই কাহিনীটির মধ্যে চৈতন্য-চরিত্রের একটি মানবিক দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও একটি পিতৃহীন বালকের প্রতি স্নেহশীল; মাতা এবং পত্নীকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। সন্ন্যাসীর সংসারের কোনও ভাবনা থাকিতে পারে না, সংসার পরিত্যাগ করিবার মুহূর্ত হইতে তাঁহার মাতা-পত্নীর প্রতি কোনও দায়িত্ব নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেবলমাত্র যদি তত্ত্ব ও দর্শনের আলোচনাতেই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসী চৈতন্যের এই একান্ত মানবিক দিকটি গোপন করিয়া রাখিতেন, তাহা তাঁহার মধ্যে থাকিলেও তিনি তাহা নিজের রচনার মধ্যে প্রকাশ করিতেন না। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও যে তিনি পিতৃহীন বালকের প্রতি বাৎসল্য, জননীর প্রতি ভক্তি এবং পত্নীর প্রতি দায়িত্ব পালন করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণদাসের একটি সংস্কার-মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই গুণে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটিতে মধ্যে মধ্যে কাব্যের স্বাদ পাওয়া যায়, ইহা কেবল মাত্র তত্ত্ব এবং দর্শনে ভারাক্রান্ত রচনা নহে।

'চৈতন্যচরিতামৃত' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত, খণ্ডগুলির নাম 'লীলা', যেমন আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় সতেরোটি পরিচ্ছেদ, মধ্য-লীলায় পঁচিশটি পরিচ্ছেদ এবং অন্ত্যলীলা বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস বর্ণিত ঘটনার যাহাতে পুনরুক্তি না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক হইয়া তিনি সেই সকল ঘটনা সংক্ষিপ্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল ঘটনা বৃন্দাবনদাসের রচনায় নাই, কেবল মাত্র তাহাই তিনি বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থখানি বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের পরিপূরক বলিতে পারা যায়।

অন্ত্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর শেষলীলা বিষয়ে যে কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই—শারদ পূর্ণিমার রাত্রে মহাপ্রভু শিষ্যদের সঙ্গে ভ্রমণ

করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রকিরণে সমুদ্রজল উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে,

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু-জলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হৈল মূর্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডোবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥

শিষ্যগণ ব্যগ্রচিত্তে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রিশেষ হইয়া গেল। এমন সময় এক জেলেকে জাল কাঁধে লইয়া আসিতে দেখিয়া সকলে তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, 'জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল।' তারপর সকলকে লইয়া গিয়া দেহটি দেখাইল।

এই কাহিনীটি সত্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তাহা হইলে পুরীতে চৈতন্য-দেবের সমাধি মন্দির উঠিত।

সূক্ষ্মতম দার্শনিক বিচার হইতে আরম্ভ করিয়া কাহিনীর বর্ণনা পর্যন্ত বাংলা ভাষা তথা ইহার পয়ার ছন্দের যে কি অসাধারণ ক্ষমতা, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে ভারতের সূক্ষ্মতম দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, জটিলতম তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়াছেন। সেই আলোচনায় সুগভীর পাণ্ডিত্য আছে, গভীরতম চিন্তা আছে, অথচ কোথাও কোনও বিষয়ে কোনও অস্পষ্টতা নাই। বাংলা ভাষায় তখনও গদ্য আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি গদ্যের কাজ যে কত সার্থকভাবে পয়ার ছন্দ দ্বারা সাধিত হইত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থখানি তাহার প্রমাণ। এই কথা সত্য, অনেক সময় তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করিতে গিয়া পয়ারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু কোথাও অর্থ অস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বাংলাভাষার যে কতদূর সম্ভাবনা আছে, গদ্যের অভাব যে একদিন কিভাবে পূর্ণ করা হইত, পয়ার ছন্দ দ্বারা যে চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনাও সম্ভব হইতে পারে এই গ্রন্থখানি তাহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়া আছে।

যে শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের জন্য চৈতন্যদেবের অবতার, সেই শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কত সহজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
'তুমি কোন বড় লোক? তুমি আমি সম॥'
প্রিয়া যদি মান করি করে যে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম কত সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তার প্রেম নাম॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বিভিন্ন তত্ত্ব এবং তথ্যমূলক উক্তির সমর্থনে যে কত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিজেই পদ্যে তাহাদের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। এই সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের বাংলায় পদ্যানুবাদের কাজটিও নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। অথচ কৃষ্ণদাস

অনায়াসে অতি সহজ বাংলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার বক্তব্য সর্বজনবোধ্য এবং যুক্তিনির্ভর করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে কৃষ্ণদাস নিরভিমান, সদাচারী ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহাকে বৈষ্ণব-বিনয় গুণের মূর্তিমান বিগ্রহ বলিয়া মনে করা যায়। তিনি তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত', গ্রন্থের পাঠক এবং শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন;

চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুইঞা করো মুই পানে॥

মঙ্গলকাব্যের শ্রোতাদিগকে তাহাদের কাব্যের কবিগণ অক্ষয় স্বর্গ বাসের আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার কাব্যের শ্রোতাদিগকে তাহাদের পাদোদক পান করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। গ্রন্থখানির রচন শেষ হইয়া গেলে ইহা নবদ্বীপের বৈষ্ণবদিগের অনুমোদনের জন্য অন্যান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে পাঠানো হইতেছিল। পুঁথিগুলিকে সিন্দুকে ভরিয়া যখন বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরের নিকট দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বিরের দস্যুদল পুঁথিগুলি মূল্যবান কোনও বং ভাবিয়া লুট করিয়া লইয়া যায়। এই সংবাদ যখন বৃন্দাবন গিয়া পৌঁছায়, তখন তাহা শুনিবামাত্র বৃদ্ধ কবি কৃষ্ণদাস প্রাণ ত্যাগ করেন। এই কাহিনী কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। 'প্রেমবিলাস' নামক যে গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণিত আছে, তাহা সর্বাংশেই নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী ও তাহাদের কবিগণ

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলীর পদ রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক জয়দেব। তিনি তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে পদাবলীর ছন্দে ও ভাষায় সংস্কৃত রূপ আরোপ করিয়া প্রথম পদাবলী রচনা করিয়াছেন, পদাবলী শব্দটিও তিনিই প্রথম প্রচলিত করিয়াছেন। তিনি নিজেকে 'কোমলকান্ত-পদাবলী'র রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই জয়দেবের ভাবাদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি, চৈতন্যদেব স্বয়ং জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদগুলি গান করিতেন। সুতরাং দেখা যায়, তিনি জয়দেব, বিদ্যাপতির সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাস রচিত পদগুলির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এই চণ্ডীদাস কে?

চণ্ডীদাস

পূর্বে একজন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' রচয়িতা এবং 'বড়ু চণ্ডীদাস, বাসুলী সেবক চণ্ডীদাস কিংবা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' নামে পরিচিত। চৈতন্য জীবনীকারগণ তাঁহাকে কেবলমাত্র চণ্ডীদাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ তাঁহার নামের আগে 'বড়ু', 'দ্বিজ', 'দীন' ইত্যাদি কোনও বিশেষণ যোগ করেন নাই। কিন্তু আরও পরবর্তী কালে এই প্রকার কোনও না কোনও বিশেষণ যুক্ত হইয়া চণ্ডীদাস নামক একজন কবির নাম ব্যবহৃত হইত।

সুতরাং মনে হয়, চৈতন্যদেবের সময় পর্যন্ত চণ্ডীদাস একজনই ছিলেন, কিন্তু পরে আরও কোনও কবি চণ্ডীদাস নামে পদ রচনা করিবার জন্য তাঁহাদের নামের আগে এই প্রকার বিশেষণ যুক্ত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের দুইটি অঞ্চলেই চণ্ডীদাস সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, একটি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা, আর একটি বীরভূম জেলার নান্নুর। অনেকেই মনে করেন, দুই জায়গায় কিংবদন্তী দুইজন চণ্ডীদাসকে লইয়া রচিত হইয়াছে, একজন বড়ু চণ্ডীদাস, আর একজন দ্বিজ চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাসই চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কবি, তিনি বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই রচিত পদ চৈতন্যদেব গান করিতেন, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালে বীরভূম জেলার নান্নুরে আবর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তাঁহার পদ তিনি গান করিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু আবার কেহ কেহ মনে করেন, চণ্ডীদাস একজনই ছিলেন, তিনি প্রথম বয়সে তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে পদাবলীর পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মধ্যে তাঁহার যৌবনসুলভ অসংযত ভাবনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই পরিণত বয়সের পদগুলির মধ্যে তাঁহার সংযত এবং সুগভীর ভাব-চেতনার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' পুঁথিখানির শেষাংশ অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলীর যাহা শ্রেষ্ঠ অংশ অর্থাৎ 'বিরহ' বা 'মাথুর' তাহা খণ্ডিত—তাহার কিছু অংশ পাওয়া যায়, কিছু অংশ

পাওয়া যায় না। সুতরাং কে বলিবে ইহার মধ্যেই তাঁহার পরবর্তী জীবনের গভীরতর ভাবের দ্যোতক পদগুলির প্রথম আভাস সূচিত হয় নাই? কারণ, দেখা যায়, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেই চণ্ডীদাসের কবিত্ব অন্যান্য বৈষ্ণব কবিকেও আকর্ষণ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেই নরহরি দাস নামক একজন বৈষ্ণব কবি বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

জয় জয় চণ্ডীদাস-দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন গাওত জগৎজনে॥
বিপ্রকুল ভূপ ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দদাতা।
যার তনুমন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস যে বর্ণিলা বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যপিল যাহার গীতে॥
শ্রীনন্দন নবদ্বীপ-পতি শ্রীগৌর আনন্দ হইয়া।
যার গীতামৃত আস্বাদ স্বরূপে রায় রামানন্দ লৈয়া॥

সুতরাং চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী যে একজন মাত্র চণ্ডীদাস ছিলেন, ইহা তাঁহারই কবিত্ব ও জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি, সুতরাং ইনিই বড়ু চণ্ডীদাস। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায় যখন পারিপাট্য দেখা দিল, তখনই গ্রাম্য বড়ু শব্দটি পরিবর্তিত হইয়া শিষ্ট দ্বিজ শব্দটি গৃহীত হইল। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করা যায়, তবে চণ্ডীদাস একজন ব্যতীত দুইজন হইতে পারে না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদও পাওয়া যায়, তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, তিনি একজন স্বতন্ত্র কবি। মূল চণ্ডীদাস হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য দেখাইবার জন্য 'দীন' বিশেষণটি যুক্ত করিয়াছেন তবে তিনি অনেক পরবর্তী কবি।

কোনও বিশেষণহীন কিংবা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতার পদগুলির মধ্য দিয়া চণ্ডীদাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, তিনি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে একক। অন্তরের গভীরতম অনুভূতি সহজ সরল কথায় মর্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করিতে তাঁহার তুলনা নাই—

সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসর না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

চণ্ডীদাসের ভাষায় কোনও অলঙ্কার নাই, কোনও শব্দের আড়ম্বর নাই, সহজ মনের কথা মনের মধ্যে যে ভাবে উদয় হয়, তিনি তাহা সেই ভাবেই প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীরাধার দৈহিক রূপের বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু গভীরতম অন্তরের সংবাদ দিয়াছেন, তিনি বিদ্যাপতির মত রূপ ও রসের কবি নহেন, তিনি ভাবালোকে যে দিব্য সৌন্দর্য আছে, তাহার কবি।

একজন চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত গৌরচন্দ্রিকার পদটি হইতেও জানিতে পারা যায়—

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ তো কভু নহে শ্যাম রায়।
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্র নীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কতি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল॥
কে বানাইল হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকন-বরণী।
নীল উজলি নীলমণি।
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী॥
সখীগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথা গেল, কিছুই না জানি।
আজু কেনে দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে ইহা চণ্ডীদাস কৃত গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী, তথাপি প্রকৃত কথা এই যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরই চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহার এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,

মরি কোন বিধি আনি সুধা-নিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি
মুরছি পড়ল হামে॥
কি আর বলিব আমি।
সে দুই আখরে কৈল জর জর
হইল অন্তরগামী॥
সব কলেবর কাঁপে থর থর,
ধরণে না যায় চিত।

কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
শুনহ পরাণ মিত ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি আদেশে
সেই সে নবীন বালা।
তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে,
পরশে ঘুচল জ্বালা ॥

এই পদটির মধ্যে চৈতন্য পরবর্তী চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাসের মূল সুরটি ধরা পড়িয়াছে। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণই হোক, কিংবা শ্রীরাধিকাই হোক, পরস্পরের নাম শুনিবামাত্রই তাঁহাদের অঙ্গ অবশ হইয়া যায়, চোখে দেখিবার কোনও প্রয়োজন করে না। চণ্ডীদাসের রচনায় অন্যত্রও পাওয়া যায়—'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো'—উপরের পদটির মধ্যেও সেই ভাবটি ধরা দিয়াছে।

শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায় ॥
রাই, এমন কেন বা হৈল।
গুরু-দুরুজন— ভয় নাহি মনে
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়ে পড়ে ॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধু বালা।
কি বা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে— করি অনুমানে
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে ॥

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার প্রেমে যে আকৃতিই থাকুক না কেন তাহার পূর্ণতা নাই। তাই শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের অনুভূতি চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর মত, তাহাতে চাঁদকে হাতে পাইবার সাধ থাকিলেও সাধ্য নাই।

চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেমের তুলনা নাই, মানুষের মধ্যে এমন প্রেম দেখা যায় না—

জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি—সে হো হেন নয়।
হিমে কমল মরে—ভানু সুখে রয় ॥
চাতক জলদ কহি—সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥

কুসুম মধুপ কহি—সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

মানুষের মধ্যে যে ভাবনা নাই, চণ্ডীদাস সেই ভাবনার ভাবুক। শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধিকার যে প্রেম তাহা মানুষে সম্ভবে না, প্রকৃতির রাজ্যেও তাহার কোনও তুলনা নাই। যদি বল কমলিনীর সঙ্গে ভানুর যে প্রেম, এই প্রেম তাহার তুল্য, তাহা সত্য হইবে না, কারণ, যখন হিমে কমলিনী শুকাইয়া যায়, তখন ভানু সুখেই থাকে, তেমনই চাতক-জলদ, কুসুম-ভ্রমর, চকোর-চাঁদ ইত্যাদি কাহারও প্রেমের সঙ্গেই রাধা প্রেমের তুলনা হয় না। চণ্ডীদাসের কাছে তাহা এক অপার্থিব অনুভূতি মাত্র।

চণ্ডীদাসের কবিতায় মিলন নাই, অভিসার নাই। তাঁহার প্রেম যেন প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলা।

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস, দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পিরিতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির, বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন, আপন কৈলুঁ পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেহলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে শ্রীরাধিকা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্যে লোক-লজ্জাভয়ে আক্ষেপ করিলেও সেই আক্ষেপের অন্তরালেও অনুরাগের ভাব গোপন হইয়া থাকে। তাই চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা বলেন,

কানড়-কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মরমে মোর ব্যাথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কানাকানি শুনি এই কথা॥
লোকে বলে কালা-পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে— সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।

দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিবা গোরা॥

শেষ পদটিতে গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের একটু ইঙ্গিত আছে। সুতরাং তিনি যে চৈতন্যদেবের পরবর্তী চণ্ডীদাস তাহা বুঝিতে পারা যায়।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মিলনেও সুখ নাই, তাই বিরহের বেদনারও কোনও নূতন তীব্রতা নাই।

শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ন-ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনো হি শিকল বান্ধে॥
তারে প্রেম-সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি—
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়ে আকুষি
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থনা
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে তব তজবিজে
পেতে পারে কিনা পারে॥

চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেমে সর্বদাই প্রাণের সংশয়, প্রেমের পূর্ণতা নাই। বিরহের মধ্যে শ্রীরাধিকা তাই অনুভব করেন—

সই, কে বলে পীরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইঞা
যে ধনী পীরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হায় অভাগিনী দুখের দুখিনী
প্রেম ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যে গতি হইল
পরাণে সংশয় দেখি॥

অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের মত শেষ পর্যন্ত ভাব-সম্মিলনের ভিতর দিয়া চণ্ডীদাসও রাধাকৃষ্ণের নিত্য মিলনের আনন্দ অনুভব করিয়াছেন—

সখি, আজি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে আওব তুরিতে
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।

বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার ॥

কৃষ্ণ-প্রেমের তত্ত্বকথা চণ্ডীদাস নিজেই শ্রীরাধার মুখে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই, সখি, তাদের কথায়,
বাহিরে রহুন তারা ॥
আমার, বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিলে আলা ॥
আলার ভিতরে কালাটি আছে,
চৌওকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যাথা ॥
তোরা পর(ম) পতি সনে শয়নে স্বপনে
সতত করিবি লেহা।
তোরা সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥
কহে চণ্ডীদাস এ মত হইলে
তবে ত পীরিতি সাজে।
তোরা না হইবি সতী, না হবি অসতী
থাকিবি ধরণী মাঝে ॥

অর্থাৎ যাহারা প্রেমধর্মের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বাইরের আচার অনুষ্ঠান লইয়া মত্ত থাকে, তাহাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই, তাঁহারা বাহিরেই পড়িয়া থাকুন। আমার বাইরের দুয়ার বন্ধ অর্থাৎ বাইরের আচার অনুষ্ঠান আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, অন্তরের মধ্যে প্রেমের যে অনির্বাণ ভাবদ্যুতি রহিয়াছে, তাহাকে ধ্যানের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছি। সেই অন্তর্লোকের কথা বাইরের জগতের কেউ বুঝে না, সুতরাং এখানে তাহা বলাও বিড়ম্বনা মাত্র। পরম পতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমরা সর্বদা দিব্য প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইবে; স্নান করিবে, কিন্তু জল স্পর্শ করিবে না, ভাবের রূপ কল্পনা করিয়া তাহা ধ্যান করিবে, যদি এমন হইতে পারে তবেই প্রেম সার্থক হয়, তোমরা সতীও হইবে না, অসতীও হইবে না, এইভাবে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তবেই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম সার্থক হইবে।

চণ্ডীদাস বাঙালীর সাধন ভজন এবং কবিত্বের ক্ষেত্রে একটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি মনুষ্যত্বের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। যে যুগে পৃথিবীব্যাপী দাস-প্রথা, ধর্মযুদ্ধ প্রভৃতির মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের চরম অমর্যাদা প্রকাশ পাইতেছিল, সেই যুগে চণ্ডীদাস এই বলিয়া মনুষ্যত্বের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন যে,

শুন হে, মানুষ ভাই ,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

মাধবেন্দ্র পুরী

মাধবেন্দ্র চৈতন্যদেবের কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর গুরু। তিনিও সন্ন্যাসী এবং পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি অদ্বৈত আচার্যেরও দীক্ষাগুরু, বয়সে সকলের অপেক্ষা প্রবীণ। তাঁহার সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করিয়াছেন,

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেমপুর।
ভক্তি কল্পতরুর তি হ প্রথম অঙ্কুর॥

তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তিনি যে কয়েকটি মাত্র বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পদও রচনা করিয়াছেন, চৈতন্যদেব তাঁহার সংস্কৃত পদ আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার বাংলা একটি পদের কিছু অংশ এই প্রকার—

সাজল ধনী চন্দ্রবদনী
শ্যাম দরশ আশে।
সঙ্গিনীগণ রঙ্গিণীসব
ঘেরিলি চারি পাশে॥
তরুণারুণ চরণ-যুগল
মঞ্জীর তঁহি শোভে।
ভৃঙ্গাবলি পুঞ্জে পুঞ্জে
গুঞ্জরে মধুলোভে॥

সর্বশেষে তিনি এই ভাবে নিজের ভণিতা দিয়াছেন—

নবযৌবনী চন্দ্রবদনী
বৃন্দাবন মাঝে।
মাধবেন্দ্র পুরী রচিত গীত
মিলল নাগর রাজে॥

ভাষার মধ্যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ভাষার প্রভাব অনুভব করা যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই যে বিদ্যাপতির প্রভাব এদেশে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে, ইহা তাহার প্রমাণ।

নরহরি

বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে নরহরি নামে দুইজন কবি আছেন—একজন নরহরি সরকার, আর একজন নরহরি চক্রবর্তী। প্রথমোক্ত নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি এবং রাধাকৃষ্ণের নামে রচিত পদাবলীর পরিবর্তে তিনি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন। নরহরি চক্রবর্তী অনেক পরবর্তী—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি। বর্তমান গ্রন্থে তাঁহার বিষয় আলোচ্য নয়।

নরহরি সরকার নরহরি ঠাকুর নামেও পরিচিত। তিনিই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনার ধারার প্রবর্তন করেন এবং সেই ধারা অনুসরণ করিয়া ক্রমে সহস্রাধিক

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচিত হয়। তাহা 'গৌরপদতরঙ্গিণী' নামক পদসংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গদেবের জীবিতকালেই যে রাধাকৃষ্ণের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরিয়া গিয়া তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের উপর ন্যস্ত হয়, নরহরি ঠাকুরের পদগুলিই তাহার প্রমাণ। তিনি কৃষ্ণলীলার পরিবর্তে যে গৌরাঙ্গলীলা দর্শনের অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত এই পদটিতে জানিতে পারা যায়—

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞিত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥

গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনার মধ্যে যে এত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া একজন বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার প্রেম-সম্পদ,
সে জানে ভকতি রসসার।
গৌরাঙ্গ মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার॥

গৌরাঙ্গলীলা শ্রবণ করিলে হৃদয় নির্মল হয়, সেই নির্মল হৃদয়েই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিবার যথার্থ উপযোগী। নতুবা কৃষ্ণলীলা সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইতে পারে না। সেইজন্য কৃষ্ণলীলা কীর্তন করিবার প্রারম্ভে গৌরাঙ্গ-লীলা কীর্তন করিয়া লওয়া হয়, তাহাকেই বলে গৌরচন্দ্রিকা।

নবদ্বীপ নরহরি ঠাকুরের কল্পনায় বৃন্দাবন হইয়া উঠিয়াছে, গঙ্গানদী যমুনা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্য গদাধর রাধা বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন,

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাঁকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহুঁ যমুনার ভানে।
ফুলবনে দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পুরুষ আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
গীত বসন আর সে মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদগদ বোলে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এ রঙ্গ নরহরি দাসে॥

কখনও শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের ব্রজবালাদিগের মত কৃষ্ণ বিরহের সুগভীর বেদনা অনুভব করেন—

হেম দরপণি গৌরাঙ্গ লাবণি
ধূলায় ধসর কাঁতি।
অশন বসন তেজিয়া রোদন
ব্রজবিলাসিনী ভাঁতি॥

কবি বৃন্দাবনলীলা আর নদীয়ালীলাকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন।

মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত চেতন্যদেবের সমসাময়িক কবি, তাঁহারা পরস্পর সহপাঠী ছিলেন---নবদ্বীপে একই গুরুর নিকট উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ গ্রহণ করিতেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যদেবের একখানি জীবনী রচনা করিয়াছেন, তাহা 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' বলিয়া পরিচিত। ইহাই চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন-চরিত। তাঁহার রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক বাংলা পদগুলি মর্মস্পর্শী। তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ পদ---

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীবন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন-পুতলি করি লয়্যাছি মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি---
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়াছি---,
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥

নবদ্বীপের জীবনে মুরারি চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী ছিলেন, তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনারই তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁহার কড়চার মধ্যে যে সকল ঘটনার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, পরবর্তী কালে চৈতন্যদেবের জীবনচরিতকারগণ প্রধানতঃ তাহার উপরই নির্ভর করিয়াছেন। সেইজন্য চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ-সমূহে তাঁহার বার বার উল্লেখ আছে। তিনি ব্যবসায়ে বৈদ্য বা চিকিৎসক ছিলেন। তাহার পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট। তিনি ধীর এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন।

রামানন্দ বসু

বর্ধমান জিলার কুলীন গ্রামের অধিবাসী 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদকারী মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসু সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর যখন নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দ্বারকাপুরীতে তাঁহার সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হয়। সেখান হইতে রামানন্দ বসু চৈতন্যদেবের সঙ্গী হইয়া নীলাচল বা পুরী পর্যন্ত আসেন। তিনি বৈষ্ণব পদ রচনায় দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, পিতামহের কৃষ্ণভক্তির তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল---

বেলি অবসান কালে একা গিয়াছিলাম জলে,---
জলের ভিতর শ্যামরায়।

ফুলের চড়াটি মাথে, মোহন মুরলী হাতে,
পুন শ্যাম জলেতে লুকায় ॥
পুন জলে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে—
বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়।
চূড়ার টালনি বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে,
জাতি কুল মজাইলাম তায় ॥
পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ
জল স্থির হইল দেখি কানু।
ধরি ধরি মনে করি, ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু ॥
কর বাড়াইয়া যাই শ্যামের নাগাল নাহি পাই,
কাঁদিতে কাঁদিতে আইলাম ঘরে।
হায়, আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম গুণমণি
সেই দুঃখে হৃদয় বিদরে ॥
বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী
অকারণে জলে ডুবেছিলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া;— জলে ছিল অঙ্গছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে ॥

বলরাম দাস

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে বলরাম দাস নামে একাধিক কবির নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে একজন চৈতন্যপার্ষদ নিত্যানন্দের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইনি নদীয়া জেলার দো-গাছি গ্রামনিবাসী ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্যগীত বিষয়েও যে কিরূপ দক্ষ ছিলেন তাহা বলরাম দাসের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি হইতে জানিতে পারা যায়—

ভাল রঙ্গে নাচে শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল ॥
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার।
পদতলে তাল ওঠে নূপুর ঝঙ্কার ॥
ছন্দ বিছন্দে কত জাগে অঙ্গভঙ্গী।
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান।
গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরী ছটা পড়য়ে দশনে ॥
বাঁধুলি জিনিয়া রাঙা ওঠখানি হাস।
ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস ॥

শেষ অর্থাৎ 'ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস' পদটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে গৌরাঙ্গদেবের নৃত্যকালীন রূপ কবি বলরাম দাস প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ বর্ণনায় বলরাম দাস লিখিয়াছেন—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপন দেখি কালারূপ খানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙা নয়ন-নাচনে॥
কি খেনে দেখিলাম, সই , নাগর-শেখর।
আঁখি ঝরে, মন কাঁন্দে, পরাণ ফাঁফর॥
সহজে মূরতিখানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া যে ধরম কৈল চূর॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি।
দেখিতে সে চাঁদ মুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসে কত সুখী ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চান্দে।
বলরাম বলে তেঞ্রি সদাই পরাণকান্দে॥

বলরাম দাসের ভাষা সহজ, সরল এবং নিতান্ত আড়ম্বরহীন। মধ্যে মধ্যে সুগভীর কবিত্বের স্পর্শে সেই ভাষা মর্মস্পর্শী হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন, 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' কিংবা 'দেখিয়া ও মুখ ছান্দ, কান্দে পুর্ণিমাক চান্দ, লাজ-ঘরে ভেজাঞা আগুনি'—ইহাদের রচনায় বলরাম দাসের মৌলিক কবিত্ব শক্তির বিকাশ দেখা যায়। গতানুগতিক বৈষ্ণব পদাবলী রচনার যে একটি প্রচলিত ধারা ছিল, তিনি তাহার প্রভাব হইতে বহুল পরিমাণে মুক্ত ছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে আরও একজন বলরাম দাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিলেন, তিনি 'প্রেমবিলাস' কাব্যের রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস। ইহার পূর্ব নাম ছিল বলরাম দাস। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহাদের উভয়ের পদ একত্র মিশিয়া গিয়াছে।

বাসুদেব ঘোষ

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক একজন বৈষ্ণব কবির নাম বাসুদেব ঘোষ। তাঁহার দুই ভাই মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ, ইহারাও বৈষ্ণব কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বাসুদেব কেবলমাত্র গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদই রচনা করিয়াছেন, তিনি গৌরাঙ্গদেবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন মনে করিতেন, সেইজন্য যাঁহাকে চোখের সামনে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়াই পদ রচনা করিয়াছেন, যাঁহাকে কল্পনা করিয়া লইতে হইত, তাঁহার সম্পর্কে কিছুই লিখিতে যান নাই। তাঁহার রচিত নিমাইর সন্ন্যাস বিষয়ক পদটি ভাবে এবং ভাষায় করুণ—

সুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে কেশ বেশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল॥

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলুথালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়,
শুনিয়া বধুর মুখে কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি,
কোনো ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে চৈতন্যদেবের সংসার-জীবনেই অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্বেই তিনি বৈষ্ণব ভক্ত এবং কবিদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছেন। সেইজন্য বৈষ্ণব কবিগণ কৃষ্ণলীলা পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনায় অধিকতর যত্নবান হইয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও মহাপুরুষের তিরোধানের আগেই এত অল্প বয়সে (তখন গৌরাঙ্গের বয়স ২৩ বৎসর কয়েক মাস) ইহার নিদর্শন নাই বলিলেই হয়।

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাস বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়, কারণ, তিনি প্রধানতঃ চণ্ডীদাসের অনুকরণ করিয়া খাঁটি বাংলা ভাষায় যেমন পদ রচনা করিয়াছেন, তেমনই ব্রজবুলী ভাষা অবলম্বন করিয়াও পদ রচনা করিয়াছেন, তবে তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলি চণ্ডীদাসের পদগুলির মতই মধুর। জ্ঞানদাস ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সিউড়ি ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী স্থান কাঁদড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার পদগুলির মধ্যে চণ্ডীদাসের ভাব-গভীরতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। অনেক সময় তাঁহার পদ এবং চণ্ডীদাসের পদ একাকার হইয়া গিয়াছে, কোন্ পদ যে কাহার রচিত তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদটি অনেক সময় চণ্ডীদাসের নামেও প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়---

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি হে, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ,
ভানুর কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।

লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাড়ল
মাণিক হারালুঁ হেলে॥
নগর বসালেম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল, মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
মরণ অধিক শেল॥

শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় জ্ঞানদাসের একটি উল্লেখযোগ্য পদ এই—

আলো মুঞি জানো না,
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে॥
চিত মোর হরিয়া নিল কালিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন-চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা॥
কটিতটে পীত বসন, রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু' কুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে—দড় করি থাক বুক॥

বিদ্যাপতির মত জ্ঞানদাস যেমন একদিকে রূপরসের কবি, তেমনই আর একদিকে চণ্ডীদাসের মত ভাবলোকেরও কবি। দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াই তাঁহার কবিত্বের সার্থকতা। সেইজন্য রূপের মধ্যে তাঁহার রাধা যেমন তাঁহার মন নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, তেমনই যৌবনের বনে নিজের মন লইয়াও লুকোচুরি খেলেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শের তিনি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। সেইজন্য চণ্ডীদাসের রাধিকার যেমন শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়াই অঙ্গ অবশ হইয়া যায়, জ্ঞানদাসের রাধিকার তাহার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণকে চোখে দেখিবারও আবশ্যকতা দেখা দেয়; এমন কি, চোখের পলক ফেলিতে তাহাতে ভরসা হয় না—

সই, কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম॥

শুধু তাহাই নহে, মুহূর্তে কতবার যে মুখখানি দেখে, তাহার অন্ত নাই—

তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মুছয়ে ঘাম।

কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে,
তেঞিসদাই লয়ে নাম ॥
জাগিতে ঘুমাইতে আন নহি চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাসে কহে এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে ॥

জ্ঞানদাসের রাধাপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের মুখের হাসি চোখে দেখিবার, মুখের কথা কানে শুনিবার প্রয়োজন আছে,

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয় ॥
আলো সই, সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে পিরিতি করয়ে
কি জানি কি তার হয় ॥
সহজ রসের আকর সে যে,
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়া যায় ॥
চমক চলনি ও গীম দোলনি
রমণী-মানস-চোর।
জ্ঞানদাস কহে— সে পিয়া পিরিতি
মরমে পশিল তোর ॥

সুতরাং ইহার মধ্যে বিদ্যাপতির রূপ-রস-গন্ধের যে মন স্পর্শ অনুভব করা যাইবে, তেমনই চণ্ডীদাসের ভাব-গভীরতাও অনুভূত হইবে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

জ্ঞানদাস যেমন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, গোবিন্দদাসকেও তেমনই বিদ্যাপতির ভাব-শিষ্য বলা হইয়া থাকে। তাঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতিও বলা হয়, কারণ, ভাবে এবং ভাষায় গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাঁহার পদ রচনা করিয়াছেন। তিনিও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সম্ভবতঃ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রজবুলী ভাষায় রচিত পদগুলি পড়িয়া একদিন তাঁহাকে সকলেই মৈথিল কবি বলিয়া মনে করিত, এখনও মিথিলার অধিবাসীরা তাঁহাকে তাহাই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন, সেই বিষয়ে এখন আর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোনও সংশয় নাই। গোবিন্দদাসের উপাধি ছিল কবিরাজ। তিনি ব্রজবুলী ভাষায় শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি। তাঁহার পর হইতে ব্রজবুলী ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীরচনার জন্য একটি বিশেষ প্রেরণা সঞ্চারিত হয়, সুতরাং ব্রজবুলি ভাষার জনপ্রিয়তা সৃষ্টির তিনিই কারণ বলিতে পারা যায়।

গোবিন্দদাস কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি

সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব' নামক নাটক এবং 'কর্ণামৃত' নামেএকখানিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব দর্শন ও অলঙ্কার সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের সংমিশ্রণের ফলে তাঁহার রচনা বিদগ্ধ সমাজের পরম উপভোগ্য হইয়াছে, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলার মধ্য হইতে সকল গ্রাম্যতা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অভিসারের পদগুলি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়াছে। একটি অভিসারের পদ এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চিরহি ঢাকি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন- ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি—

অর্থাৎ এখানে শ্রীরাধিকা বর্ষাকালীন অভিসারের অভ্যাস করিতেছেন। কবি লিখিতেছেন, মাটিতে তিনি কাঁটা পুতিয়া পায়ের নূপুরে কাপড় বাঁধিয়া (যাহাতে পথে বাহিরে হইবার সময় শব্দ না হয়), কলসীর জল ঢালিয়া পথ পিছল করিয়া তাঁহার কমল তুল্য পদে পথ চলিতেছেন। হে মাধব, তোমার অভিসারের জন্য শয়ন-মন্দিরে রাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রীরাধিকা দুস্তর পথ অতিক্রম করিবার সাধনা করিতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দদাস কবিরাজই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ব্রজবুলী ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

অনন্ত দাস

অনন্ত দাস নামে একজন বৈষ্ণব কবির অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভণিতাযুক্ত সকল পদই একজনের রচিত কি না, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। একজন অনন্ত দাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে বর্তমান ছিলেন, তিনিই অধিক সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি একজন প্রতিভা-শালী কবি ছিলেন, একদিকে তাঁহার ভাষায় সরলতা যেমন হৃদয়গ্রাহী, অন্যদিকে তেমনই অলঙ্কার-সমৃদ্ধ পদগুলিও আকর্ষণীয়। তাঁহার শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা-মূলক একটি পদের কিয়দংশ এই ঃ

ধনি কনক-কেশর-কাঁতি।
বনি বদন-বিধুর ভাঁতি॥
জিনি নীল-নলিন বাস।
কিয়ে অমিয়া-মধুর ভাষ॥
তাহে চিকুর কবরী ভার।
হিয়ে লম্বিত মাণিক হার॥

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে বাংলা কবিতার কত রকম ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনন্ত দাসের কবিতায় তাহার কিছু নিদর্শন দেখা যায়।

লোচন দাস

'চৈতন্যমঙ্গল' নামক চৈতন্যজীবনী রচয়িতা লোচন দাস একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। বর্ধমান জিলার মঙ্গলকোটের নিকটবর্তী কোগ্রাম লোচন দাসের জন্মভূমি। তিনি সম্ভবত ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন. বৈষ্ণব সাধক কবি নরহরি ঠাকুরের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরহরি ঠাকুর চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। চৈতন্যদেব নিজেই বলিয়াছেন, 'শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।' লোচন দাস লেখাপড়া বেশি জানিতেন না, তথাপি স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন, ভাষার সরলতা এবং স্বাভাবিকতা তাঁহার কাব্যের বিশেষ গুণ। তবে তাঁহার মধ্যে চণ্ডীদাসের মত ভাবের প্রগাঢ়তার অভাব দেখা যায়। তিনি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের নাম'ধামালী'। ইহাদিগকে বিশুদ্ধ পদাবলীবলা যায় না, ইহারা অনেকটা গ্রাম্য সঙ্গীত বা লোক-সঙ্গীতের মত, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রত্যেকটিরই বিষয়বস্তু। তিনি গৌরাঙ্গ বিষয়েও পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত নিম্নোদ্ধৃত পদটি ছেলে ভুলানো ছড়ার মত শুনায়—

চান্দা চান্দা চান্দা গগন উপরে
কে পাড়িয়া আনি নিব।
কলঙ্ক মুছিয়া আমার গোরার
কপালে চিত লিখিব ॥
আয় আয় আয়, আমার সোনার সুত নিমাই
নিন্দের লাগিয়া কান্দে।
আখটি করিতে একটি বোল যেন
অমিয়া অধিক লাগে ॥

শেষ পদটির অর্থ—তাহার আব্দারের এক একটি কথা যেন অমৃত হইতে অধিক সুমিষ্ট।

কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি

বাংলার বৈষ্ণব পদরচয়িতাদিগের মধ্যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির বিপুল প্রভাব দেখিয়া কোনও কোনও বাঙ্গালী কবিও নিজেকে বিদ্যাপতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের উপাধি ছিল কবিরঞ্জন। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'কবিরঞ্জন' তথাপি 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিয়াও তাঁহার পরিচয় ছিল। অনেক সময় দুই নাম এক হওয়ার জন্য মিথিলার বিদ্যাপতির কবিতাও তাঁহার নামে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পদটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে,

মরিব মরিব, সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥
তোমরা যতেক সখী থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণ-কালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে ॥

ললিতা প্রাণের সখী মন্ত্র দিয়ো কানে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে ॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মারিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিনি বিদ্যাপতি নাম গ্রহণ করিলেও সর্বত্রই যে বিদ্যাপতির ভাষা কিংবা ব্রজবুলীর অনুকরণে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার পদাবলীর সহজ সরল এবং অকৃত্রিম একটি ভাষাও ছিল।

রামানন্দ রায়

রামানন্দ রায় অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত বিজয়নগরের রাজমন্ত্রী ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চৈতন্যদেব তখন দাক্ষিণাত্যে তীর্থ পর্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। সেখানে গোদাবরী নদীর তীরে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য ও রাজমন্ত্রী রামানন্দ রায়ের সাক্ষাত হয়। তাঁহারা সেখানেই পরস্পর তত্ত্বালোচনার পর পরস্পরের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। রামানন্দ চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, ক্রমে বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে আসিয়া বসবাস করিয়া শেষ জীবন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। খৃষ্টীয় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ বাসী হইলেও এবং ওড়িয়া ভাষা তাঁহার মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্রজবুলীতে পদ রচনা করেন। তবে তাঁহার একমাত্র পদই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রাম রায়ের ভণিতায় আরও যেসকল পদ পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোনও কবির রচনা হওয়াই সম্ভব। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সেইজন্য ব্রজবুলীতে পদ রচনা করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। তাঁহার রচিত সুপরিচিত ব্রজবুলীর পদটির অংশ এই—

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
এ সখি, সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরহ জনি ॥
বর্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

শেষ দুইটি পদে উড়িষ্যার সেই সময়কার রাজা প্রতাপ রুদ্রের নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে তাঁহার মান বৃদ্ধি হউক। প্রতাপরুদ্রও চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চম্পতিপতি

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চম্পতিপতি নামক একজন কবির নাম পাওয়া যায়। তিনিও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি বিদ্যাপতির নামটি নিজের নামের উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, তিনি অনেক স্থলেই 'বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ' এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন তিনি ব্রজবলী ভাষায় উৎকৃষ্ট কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ

অনুমান করিয়াছেন, চম্পতিপতি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি চৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার রচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার একটি পদের কিয়দংশ এই—

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মীলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রমভরে বচন কহে গদগদ
খরতর বহই নিশাস॥
মাধব, দুর্জয় মানিনী মানী।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত,
না ফুরয়ে এই আধ বাণী॥

এই কাব্যভাষা উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী ভাষার নিদর্শন।

পদাবলী সাহিত্যে ভূপতি সিংহের ভণিতায় কয়েকটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের সঙ্গে চম্পতিপতি রচিত পদগুলির আশ্চর্য মিল আছে। সেইজন্য অনেকেই মনে করিয়াছেন, ভূপতি সিংহ এবং চম্পতিপতি একই ব্যক্তি। আবার অনেকে মনে করেন, ভূপতি সিংহ বলিতে চম্পতিপতি প্রতাপরুদ্রকে মনে করিয়াছেন এবং তাঁহার মন্ত্রিরূপে তাঁহার প্রতি উক্তরূপ ভণিতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলা কঠিন।

যদুনন্দন দাস

১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাসের জন্ম হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'কর্ণানন্দ' নামক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি 'বিদগ্ধমাধব' ও 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থের সুললিত পয়ার ছন্দে বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। তিনি যদুনাথ নামেও পরিচিত। সুতরাং যদুনাথের ভণিতার যে সকল বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই রচনা। তিনি তাঁহার 'গোবিন্দলীলামৃতর' অনুবাদে লিখিয়াছেন—

নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস।
সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনাথ দাস॥

সুতরাং যদুনন্দন ও যদুনাথের ভণিতায় যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহা একই কবির রচিত বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার একটি অপূর্ব বাৎসল্যরসের কবিতা এই প্রকার—

হে দে গো রামের মা, ননীচোরা গেল এই পথে?
নন্দ মন্দ বলুক মোরে— লাগালি পাইলে তারে,
সাজাই করিব ভাল মতে॥
শূন্য ঘরখানি পায়্যা সকল নবনী খায়্যা
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
অঙ্গুলীর চিনাগুলি বেকত হইবে বলি',
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পাণী॥
ক্ষীর ননী ছেনা চাঁছি উভ করি শিকাগাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।

আনিয়া মথন-দণ্ড ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড
নামতে থাকিয়া মুখ পাতে ॥
ক্ষীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয়,
কি ঘর করনে বসি মোরা।
যে মোরে দিয়াছে তাপ সে মোর হয়্যাছে পাপ
পরাণে মারিব ননীচোরা ॥

নরোত্তম দাস

রাজসাহী জিলার গোপালপুর গ্রামে খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম দাসের জন্ম হয়। নরোত্তম ঐশ্বর্যশালীর পুত্র ছিলেন, কিন্তু যৌবনেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম ও রসশাস্ত্র বিষয়ে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার প্রত্যেকটি গ্রন্থ অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার 'প্রার্থনা' নামক গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। নরোত্তম দাসের আর একটি প্রধান গুণ ছিল, তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক ছিলেন। তিনি গড়েন হাটি ঘরানার কীর্তনের প্রথম প্রবর্তক। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু বহু ব্রাহ্মণও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি নরোত্তম দাস ঠাকুর নামে পরম সম্মানিত। তিনি একাধারে আচার্য, পদ-রচয়িতা ও কীর্তন-গায়ক। তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি বৈষ্ণবসমাজে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার একটি পদ এই—

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায় ॥
কাঁহা দিব্যাঞ্জন মোর নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাঁহা নবঘন শ্যাম ॥
অমৃতের সার কাঁহা সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাঁহা মুরলী-বদন ॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমতি হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন ॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশুপাখী করয়ে বিষাদ ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর ॥

সৈয়দ মর্তুজা

সৈয়দ মর্তুজার ভণিতায় বহু বৈষ্ণব পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান ভাগ; প্রথম ভাগে যে সব পদ মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদসংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে যেসকল পদ বাংলা দেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহারা একই কবির রচিত বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে সৈয়দ মর্তুজা নামে পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র একজন কবি ছিলেন। যাঁহার পদ বৈষ্ণব পদসঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে, তিনি খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদ জিলায় জঙ্গীপুর মহকুমার বালিঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেলেন বলিয়া অনেকেই অনুমান করিয়াছেন। তিনি রাজাক নাম একজন পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে জঙ্গীপুর মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে তাহার সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি!
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে,
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আন্‌চান
দণ্ডে শতবার মরি॥
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু।
সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে—
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥

মঙ্গলকাব্য

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর মহাত্ম্য-সূচক এক শ্রেণীর আখ্যায়িকা কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহা সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্য বলিয়া পরিচিত। অবশ্য ইহারা গানের উদ্দেশ্যে রচিত হইত বলিয়া ইহাদিগকে সাধারণভাবে মঙ্গল গানই বলিত। ক্রমে মঙ্গলকাব্য নামটি প্রচলিত হইয়াছে। বিষয় অনুযায়ী ইহারা কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত ছিল, যেমন মনসার মাহাত্ম্য সূচক কাহিনী যাহাতে বর্ণিত হইত, তাহা মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীর মাহাত্ম্য যাহাতে কীর্তিত হইয়াছে, তাহা চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য যাহাতে কীর্তিত হইয়াছে, তাহা ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত। এই প্রকার আরও বহু দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী সে দিন অত্যন্ত জনপ্রিয় ইহা উঠিয়াছিল। তবে প্রকৃত পক্ষে তাহা শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব সমাজ চৈতন্য-জীবন ও তাহার মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া যে সকল চরিত-কাব্য রচনা করিয়াছিল, বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-মঙ্গল নামে তাহা যেমন একটি ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল, শাক্ত সমাজের দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক আখ্যায়িকা কাব্যগুলিও তেমনই আর একটি ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই দুইটি ধারার একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া, আর একটি শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া সমান্তরাল ভাবেই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে দুইটি ধারাই পরস্পরের প্রভাবে অত্যন্ত প্রবল এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

মনসা-মঙ্গল

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসা-মঙ্গলই সর্বপ্রথম রচিত হয় বলিয়া মনে হয়, কারণ, দেখা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দীতেই কয়জন শ্রেষ্ঠ কবি এই বিষয় লইয়া কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ববর্তী শতাব্দীতেই এই ধারাটির সূচনা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মনসা-মঙ্গলের আখ্যায়িকাটি এই প্রকার—

চন্দ্রবংশে পশুসখা নামে এক রাজা ছিলেন। বার্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া একদিন অরণ্যে এক নদীতীরে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, দুইটি পক্ষীশাবক স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিয়া তাঁহার করুণার উদয় হইল; নদীতে সাঁতার কাটিয়া উহাদিগকে ধরিয়া আনিলেন, তারপর বৃক্ষকোটেরে রাখিয়া সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি পক্ষীশাবকের আহার সন্ধান করিতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় মনসার এক সাপ আসিয়া উহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। তপস্বী ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার পালিত শাবক দুইটি সাপে খাইয়া গিয়াছে, তখন তিনি শোকে উন্মত্ত হইয়া গেলেন। তারপর এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন যে, তিনি পরজন্মে সাপের শত্রু হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।

তিনি চম্পকনগরে এক সদাগরের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম হইল চন্দ্রধর। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সদাগর হইলেন। তাঁহার ছয় পুত্র

জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে তাহাদিগকে বিবাহ করাইলেন। মনসাদেবী নিজের পূজা প্রচার করিবার জন্য মর্ত্যে আসিলেন, দেখিলেন ধনেমানে প্রতিপত্তিতে চাঁদ সদাগরের তুল্য ব্যক্তি সমাজে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি তাঁহার পূজা পাইবার অভিলাষ করিলেন। চাঁদ সদাগরের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়িল—তিনি মনসাকে হেঁতালের লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া গেলেন, তারপর ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে বাস করিয়া কেহ সর্পদেবী মনসার পূজা করিতে পারিবে না। মনসা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গেলেন, চাঁদের উপর কঠিন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি চাঁদের বাগানবাড়ী বিনষ্ট করিলেন, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া তাঁহার ছয় পুত্রকে বিনাশ করিলেন। তথাপি চাঁদ অটল রহিলেন; তিনি শিবের উপাসক, তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে হাতে তিনি শিবপূজা করেন, সেই হাতে চেঙমুড়ি কানী মনসার পূজা করিবেন না।

চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া চাঁদ সদাগর বাণিজ্য করিবার জন্য বাহির হইলেন। মাঝ সমুদ্রে মনসা আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, আমার পূজা কর, নতুবা তোমার সর্বনাশ করিব। চাঁদ সদাগর মনসাকে গালাগালি দিয়া খেদাইয়া দিলেন। সমুদ্রে তুমুল ঝড় উঠিল, চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল, চাঁদ সর্বস্বান্ত হইয়া কোন মতে সমুদ্রের তীরে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। অপরিচিত দেশে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল, বার বৎসর পর কোন রকমে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আর একটি পুত্র হইল, নাম লখীন্দর। ক্রমে তাহার বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু চাঁদ সদাগর জানিতেন, বিবাহের রাত্রে সর্প-দংশনে পুত্রের মৃত্যু লেখা আছে। তিনি এক লোহার বাসর নির্মাণ করিলেন। বেহুলার সঙ্গে লখীন্দরের বিবাহ দিয়া বর-বধূকে লোহার বাসরে আনিয়া রাখিলেন। কিন্তু লোহার বাসরের এক গোপন ছিদ্রপথ দিয়া সর্প প্রবেশ করিয়া লখীন্দরকে দংশন করিল; সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হইল। চাঁদ সদাগর ও তাঁহার পত্নী সনকা শোকে উন্মাদ হইয়া গেলেন। কিন্তু বেহুলা অচল অটল রহিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, স্বর্গরাজ্যে গিয়া সে তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবে। এই উদ্দেশ্য এক ভেলার উপর লখীন্দরের শবদেহ রাখিয়া গাঙুরের জলে ভাসিয়া সে স্বর্গের পথে যাত্রা করিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ফিরিবার জন্য কত অনুরোধ করিল; কিন্তু বেহুলা কাহারও কথা শুনিল না। নদীস্রোতে ভাসমান ভেলার উপর তাহার দিনের পর রাত্রি কাটিতে লাগিল, লখিন্দরের শব পচিয়া গলিয়া গেল—কেবল অস্থি কয়খানি অবশিষ্ট রহিল। ছয় মাস পর স্বর্গের ঘাটে গিয়া তাহার ভেলা ঠেকিল। স্বর্গের ধোপানী নেতার সাহায্যে বেহুলা দেবসভায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেবতাদিগকে নৃত্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সে তাহার স্বামীর ও ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরিয়া পাইল। সকলকে লইয়া বেহুলা দেশে ফিরিল। তাহার অনুরাধে চাঁদ সদাগর বাম হাতে মনসাকে একটি ফুল দিলেন, তাহাতেই মর্ত্যলোকে মনসার পূজা প্রচার লাভ করিল।

হরিদত্ত

এই বিষয় লইয়া যিনি প্রথম কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম যতদূর জানিতে পারা যায়, তিনি হরিদত্ত। তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ, পঞ্চদশ

শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মনসামঙ্গলের কবি বলিয়াছেন, 'হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।' অর্থাৎ কালক্রমে হরিদত্তের রচিত সমস্ত গীত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

হরিদত্ত রচিত মনসার সর্পসজ্জার একটি পদ বড় সুন্দর, তাহার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলার পুতলী।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলী॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলী।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলী॥
কর্কট নাগে পদ্মার গলার হার।
অঙ্গুরি হৈল তবে নাগ ব্রহ্মজাল॥
দুই হস্তের শঙ্খ হৈল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগে শোভে সুন্দর কিঙ্কিণী।

হরিদত্ত কবি এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু যে কয়টি বিচ্ছিন্ন রচনা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্য দিয়া তাঁহার কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, উচ্চ কল্পনাশক্তি এবং সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের এক শত বৎসর পূর্বেই যে এমন মার্জিত রুচিসম্পন্ন একজন কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বিস্ময়কর।

নারায়ণ দেব

আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মনসা-মঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার নাম নারায়ণদেব। তিনি তাঁহার আত্ম পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জিলার বোরগ্রাম নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ, মাতার নাম রুক্মিনী। তাঁহার পূর্বপুরুষদের গৃহে তাঁহাদের যে কুলপঞ্জী আছে, তাহা হইতে মনে হয়, তিনি অন্ততঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তিনি লিখিয়াছেন—

নারায়ণ দেব কয় জন্ম মগধ।
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ॥
অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদ্গোল্য গোত্র মোর গাঁইগুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যাজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি॥

নারায়ণ দেব তাঁহার কাব্যরচনার কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে,

মনসা বা পদ্মা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তাঁহার মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। মনসার আর এক নাম পদ্মা। পদ্মার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পদ্মাপুরাণও বলিত।

নারায়ণদেব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, বহু পুরাণ পাঠ করিয়া তাহাদের নানা প্রসঙ্গ তিনি তাঁহার মনসা-মঙ্গলে বর্ণনা করিয়াছেন। নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল সারা আসামে প্রচার লাভ করিয়া অসমীয়া ভাষায় অনুদিত হইয়া গিয়াছে। সেখানকার অধিবাসীরা নারায়ণদেবকে অসমীয়া বলিয়াও মনে করেন এবং তাঁহার রচনা প্রাচীন অসমীয়ার নিদর্শন রূপে পাঠ করেন।

বিজয় গুপ্ত

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসা-মঙ্গলের আর একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার নাম বিজয় গুপ্ত। তিনি বরিশাল জিলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যরচনার তিনি যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ। তখন হুসেন শাহ্ গৌড়ের নবাব। তিনি তাঁহারও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মনসামঙ্গল রচনার কাল নির্দিষ্ট রূপে জানিতে পারা যায়।

তিনি লিখিয়াছেন,

ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিলা পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেহাবাদ বাঙারোড়া তক্‌সিম॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রীগ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারিবেদ ধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বৈসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের শূর।
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়॥

চাঁদ সদাগর ও মনসার কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া বিজয় গুপ্ত সে যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে সেই যুগের জীবন সম্পর্কে আমাদের অনেকখানি ধারণা হয়। বিজয় গুপ্তের জীবন-দৃষ্টি বাস্তবধর্মী ছিল, তিনি খুঁটিনাটি করিয়া নরনারীর চিত্র এবং চরিত্র বর্ণনায় দক্ষ ছিলেন। তাঁহার রচনা অনেক সময় করুণ রসসিক্ত। লখীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার বিলাপের একটি অংশ এই—

আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হৈয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল॥

সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধিব।
হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব ॥

হাস্যরসাত্মক রচনাতেও বিজয় গুপ্ত দক্ষ ছিলেন।

বিপ্রদাস পিপিলাই

১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ যখন গৌড়ের নবাব তখন বিপ্রদাস পিপিলাই নামে একজন কবি একখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ২৪ পরগণা জিলার বাদুড়্যা বটগ্রাম নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও পদ্মার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া তাঁহার কাব্য রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে ॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ ॥
কবি গুরু ধীর জনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার ॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান ॥
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত ॥

দ্বিজ বংশীদাস

বংশীদাস নামক কবি মনসা-মঙ্গল রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ মনে করেন তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তিনিও আত্ম পরিচয়ে লিখিয়াছেন, তাঁহার পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র তীরে পাতুয়ারী গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রামটি মৈমনসিংহ জিলায় ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত। বংশী দাস একাধারে কবি ও সাধক ছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি দ্বিজ বংশীদাস নামে সুপরিচিত। তাঁহারই বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করিয়া মহিলা কৃত্তিবাস খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি এইভাবে তাঁহার পিতৃ পরিচয় দিয়াছেন,—

ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর পাতার ছাউনী ॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায় ॥
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে আখ্যায়িকা কাব্যের ধারা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীমঙ্গল নামে পরিচিত। এই ধারায় মধ্যযুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, একজন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একজন অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রথমোক্তের নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কন এবং দ্বিতীয়োক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও ইহাদের রচনা নানাদিক হইতে আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়া মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। মনসামঙ্গলের মধ্যে আদ্যোপান্ত যেমন একটি কাহিনী পাওয়া যায়, চণ্ডীমঙ্গলে তাহার পরিবর্তে দুইটি কাহিনী আছে। যদিও যে দেবীর ইহাতে মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে, তাঁহার নাম চণ্ডী, তথাপি তিনি পৌরাণিক চণ্ডী, পার্বতী কিংবা দুর্গা নহেন, তিনি লৌকিক চণ্ডী, তিনি মহিষমর্দিনী নহেন, তাঁহার চরিত্রের অন্য গুণ আছে, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের স্ত্রী-সমাজের সম্পর্ক, এমন কি, পুরুষের সঙ্গেও তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই। চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনীর একটির নায়ক ধনপতি সদাগর, আর একটির নায়ক কালকেতু ব্যাধ। দুইটি কাহিনীর চণ্ডীও এক নহেন, তাঁহাদের বিভিন্ন গুণ। ধনপতির কাহিনীর চণ্ডী মঙ্গলচণ্ডী, ইনি স্ত্রীসমাজের দেবী, গার্হস্থ্য জীবনের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীজাতি তাঁহার উপাসনা করে; কিন্তু কালকেতু ব্যাধের কাহিনীর চণ্ডী ব্যাধের দেবতা, শিকারে কৃতকার্য হইবার জন্য ব্যাধসমাজ তাঁহার পূজা করিত। কালক্রমে সব দেবীই চণ্ডী নামে পরিচিত হইতে থাকেন। বলাই বাহুল্য, এই দুই চণ্ডীর কাহারও সঙ্গে মহিষমর্দিনী চণ্ডী বা পৌরাণিক চণ্ডীর কোনও সম্পর্ক নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি এই প্রকার। প্রথমেই কালকেতুর কাহিনী— ইন্দ্র একদিন শিবপূজা করিবার আয়োজন করিয়া পুত্র নীলাম্বরকে ফুল তুলিয়া আনিবার জন্য বলিলেন। নীলাম্বর ফুল তুলিতে বাহির হইল; কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইল, নন্দন কাননে সেদিন একটিও ফুল নাই। চণ্ডী মর্ত্যে নিজের পূজা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে একটি ফাঁদ পাতিলেন, তাহাতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইল। নীলাম্বর স্বর্গ ত্যাগ করিয়া ফুলের সন্ধানে মর্ত্যলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, এক ব্যাধ এক হরিণের পিছু তাড়া করিয়া যাইতেছে। ব্যাধের স্বচ্ছন্দ জীবনের তুলনায় নিজের পরাধীন জীবনের কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনমনা হইয়া গেলেন। ফুল লইয়া ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেল। চণ্ডী কীটরূপ ধারণ করিয়া একটি ফুলের পাঁপড়ির নীচে ইচ্ছা করিয়াই লুকাইয়া রহিলেন। নীলাম্বরের বিলম্ব দেখিয়া ইন্দ্র তাহাকে গালাগালি করিলেন, তারপর সেই ফুল দিয়া যখন শিবপূজা করিলেন, তখন ফুলের পাঁপড়ির নীচ হইতে কীট-রূপিণী চণ্ডী বাহির হইয়া আসিয়া শিবকে দংশন করিলেন। দংশনের জ্বালায় শিব অস্থির হইয়া উঠিয়া ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্র নিরুপায় হইয়া নীলাম্বরকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফুল তুলিবার সময় আজ তোমার কি হইয়াছিল, বল।' নীলাম্বর বলিলেন; 'এক ব্যাধ হরিণের পিছনে তাড়া করিয়াছিল, তাহাই বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিলাম।' শিব তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভিশাপ দিলেন, 'যাও, মর্ত্যে ব্যাধের সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' নীলাম্বর

মর্ত্যলোকে কালকেতু নাম লইয়া ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল, তাহার পত্নী ছায়া তাহার সঙ্গে সহমরণে গিয়া মর্ত্যলোকে আর এক ব্যাধের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল, তাহার নাম হইল ফুল্লরা। ক্রমে তাহাদের উভয়ের বিবাহ হইল। পিতা ধর্মকেতুর মৃত্যুর পর সংসার পালনের দায়িত্ব কালকেতুর উপর পড়িল। বনে পশুবধই তাহার জীবিকার একমাত্র উপায় হইল। সে ভারে ভারে বন হইতে পশু শিকার করিয়া আনিত, ফুল্লরা হাটে লইয়া গিয়া তাহা বিক্রয় করিত। এইভাবে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল। কালকেতুর বিক্রমে বন প্রায় পশুশূন্য হইয়া যাইতে লাগিল। পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডী; তাঁহার নিকট গিয়া সকল পশু মিলিয়া একসঙ্গে অভিযোগ করিল। চণ্ডী তাহাদিগকে অভয় দিলেন। তারপর কালকেতুকে নানারকম ধনরত্ন দিয়া গুজরাটে এক নগর পত্তন করিয়া রাজা হইয়া বসিবার পরামর্শ দিলেন, তাহাকে আর পশুবধ করিতে নিবারণ করিলেন। কালকেতু তাহাই করিল। ভাঁড়ু দত্ত নামক এক শঠ ব্যক্তি তাহার সঙ্গে শত্রুতা করিয়া কলিঙ্গরাজকে প্ররোচনা দিয়া তাহার রাজ্য আক্রমণ করাইল। কিন্তু চণ্ডীর কৃপায় কালকেতুর রাজ্য শত্রুর অধিকারমুক্ত হইল, ভাঁড়ু দত্ত তাহার কার্যের জন্য উপযুক্ত দণ্ড পাইল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী অর্থাৎ ধনপতির কাহিনীটি এই—উজানী নগরে ধনপতি নামে এক সদাগর ছিলেন। একদিন তিনি পায়রা উড়াইতেছিলেন, তাঁহার একটি পায়রা বাজ পাখীর তাড়া খাইয়া খুল্লনার অঞ্চলের নীচে গিয়া লুকাইল। খুল্লনা সেই নগরীরই আর এক বণিকের কন্যা, তাহার তখনও বিবাহ হয় নাই। ধনপতি পায়রা খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন খুল্লনা পায়রাটিকে হাতের উপর লইয়া আদর করিতেছেন। ধনপতি পায়রাটিকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন, খুল্লনা দিলেন না বরং উহা লইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। খুল্লনা সম্পর্কে ধনপতির শ্যালিকা। ধনপতি তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি গৃহে ফিরিয়াই খুল্লনার পিতার নিকট একজন ঘটক পাঠাইলেন—তিনি খুল্লনাকে বিবাহ করিতে চাহেন। খুল্লনার পিতা আপত্তি করিলেন না। ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা একটু আপত্তি করিলেন। কিন্তু পাঁচতোলা সোনা ও একটি পাটশাড়ী পাইয়া তিনিও আর আপত্তি তুলিলেন না। বিবাহ হইয়া গেল। ধনপতি কিছুদিনের জন্য বিদেশে গেলেন এই সুযোগে লহনা দুর্বলা দাসীর পরামর্শে তাঁহার সপত্নী খুল্লনার উপর নানাভাবে অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ধনপতি দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে'জন্য লহনাকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ধনপতি বাণিজ্যের জন্য পুনরায় বিদেশে যাত্রা করিলেন। লহনার উপর খুল্লনার ভার দিয়া তিনি সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া চন্দন আনিবার জন্য সিংহল রওয়ানা হইলেন। যাত্রার সময় তাঁহার মঙ্গলের জন্য খুল্লনা চণ্ডীপূজা করিতেছিলেন, শিবের উপাসক ধনপতি চণ্ডীকে ডাইনী দেবতা বলিয়া তাঁহার ঘটে লাথি মারিলেন। মাঝ সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার প্রতিশোধ লইবার আয়োজন করিলেন। ধনপতি সমুদ্রমধ্যে সহসা একটি পদ্মবন দেখিতে পাইলেন। সেই পদ্মবনের মধ্যে একটি নারী প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে বসিয়া একটি হাতী একবার গিলিতেছেন, আর একবার মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন—ইহার নাম 'কমলে কামিনী'। এই বৃত্তান্ত তিনি সিংহল রাজার নিকট গিয়া বর্ণনা করিলেন। সিংহল রাজা ইহা বিশ্বাস করিলেন না, সমুদ্র মধ্যে আসিয়া তাহা দেখিতে চাহিলে ধনপতি তাহা

দেখাইতেও পারিলেন না। ফলে সিংহলের কারাগারে তিনি বন্দী হইয়া রহিলেন। দেশে খুল্লনার গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম শ্রীমন্ত; দীর্ঘকাল পিতার কোনও সংবাদ না পাইয়া সে নিজেই পিতার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। পথে সেও 'কমলে কামিনী' দেখিয়া সিংহলরাজকে গিয়া তাহা জানাইল। সিংহলরাজ এবারও তাহা বিশ্বাস করিলেন না, শ্রীমন্তও তাঁহার তাহা দেখাইতে পারিলেন না। সেও সিংহলের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কারাগারের মধ্যে পিতা-পুত্রের পরিচয় হইল। চণ্ডীর কৃপায় উভয়েই মুক্তি লাভ করিল। শ্রীমন্ত সিংহল-রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া পিতার সঙ্গে স্বদেশে ফিরিল।

এই দুইটি কাহিনী লইয়া যিনি প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাঁহার নাম মাণিক দত্ত। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই আবর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ, ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁহাকে আদি কবি বা চণ্ডী-মঙ্গল গানের প্রবর্তক বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন,

মাণিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥

মাণিক দত্ত মালদহ জিলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ, তিনি তাঁহার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সব কয়টিই মালদহ জেলার নদনদীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেখানেই মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল এখন পর্যন্তও গান করা হয়।

মাণিক দত্ত যে কেবলমাত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি বলিয়াই উল্লেখ-যোগ্য তাহা নহে তিনি সুকবি ছিলেন; তাঁহার রচনায় যদিও তখন পর্যন্ত পারিপাট্য বা পরিচ্ছন্নতা দেখা দেয়নি, তথাপি তাহা স্থানে স্থানে মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। প্রসূতির মুখ হইতে শিব-নিন্দা শুনিয়া সতীর মনোভাব বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,

অঝোরে কান্দিয়া চক্ষুর মোছে পানি।
মোর স্বামীর নিন্দা কর অধম জননী॥
যত কন্যা আছে তোমার জগত-সংসারে।
কেহ দাসী কেহ দাস কি কব তাহারে॥
শক্তিরূপী দেবী হয় যাহার সন্তান।
বিষ্ণুরূপী বসোয়া যাহার বাহন॥
তুমি জ্ঞানে—না জানিলে সে দেব কেমন।
ভূত ভূত বলি তুমি বল কার তরে।
পঞ্চভূত আত্মা দেখ তোমার শরীরে।

দ্বিজ মাধব

খৃষ্টীয় ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিজ মাধব নামক একজন কবি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তাঁহার কাব্যের নাম 'সারদা মঙ্গল' এবং 'সারদা চরিত'। তিনি তাঁহার কাব্য রচনার সময় সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিবার ফলে তাঁহার আবির্ভাব কাল কিংবা তাঁহার কাব্য রচনা কাল সম্পর্কে কাহারও কোনও সংশয় নাই। তাহা ছাড়াও তিনি দিল্লীর সম্রাট আকবরের নাম করিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার সময় জানিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার পিতার নাম পরাশর। তিনি

সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে দ্বিজ মাধবের পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

আত্মপরিচয়ে তিনি লিখিয়াছেন,

পঞ্চ গৌড়নামে এক গ্রামের প্রধান।
একাব্বর অধিকার অর্জুন সমান॥
প্রতাপে তপন রাজা জ্ঞানে বৃহস্পতি।
কলিযুগে তার তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ধরায় ত্রিবেণী গঙ্গা বহে নিরন্তর॥
সপ্তদ্বীপ মাঝারে নদীয়া এক স্থান।
ব্রাহ্ম ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র অনেক প্রধান॥
পরাশর সুত হয়, মাধব তার নাম।
কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম॥

দ্বিজ মাধবের কবিত্ব অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ছিল, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পারিবারিক জীবন-চিত্রকে তিনি সার্থক রূপায়িত করিয়াছেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কেবলমাত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনাতেই নয় মধ্যযুগের সমগ্র মঙ্গলকাব্য রচনার ক্ষেত্রেই মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অবিসংবাদিত রূপে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র কবি অপেক্ষা বড় শিল্পী, কিন্তু কবিত্বের দিক দিয়া মুকুন্দরামের তুলনা নাই। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাহার শেষ ভাগে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ৪।৫ বছরের মধ্যেই তাঁহার কাব্য রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। তিনি একটি দীর্ঘ আত্ম-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেশের, সমাজের এবং নিজের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, তিনি বর্ধমান জিলার রায়না থানার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাত পুরুষ যাবৎ সেখানেই বাস করিতেছিলেন, অবশেষে মাহমুদ সরীপ নামক একজন অত্যাচারী ডিহিদার কর্তৃক সাত পুরুষের ভিটা হইতে উৎখাৎ হইয়া সপরিবারে অনিশ্চিত জীবনের পথে বাহির হইয়া পড়েন। পথে নানা দুঃখকষ্ট অনাহার ও নিরাশ্রয়ে কাটাইয়া অবশেষে মেদিনীপুর জিলার আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে তাঁহার পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাজা হন, তাঁহার আদেশে তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন—

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিল আচম্বিতে॥

সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥
উজির হল্য রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইল কাল খিলভূমি লিখে লাল,
বিনা উপকারে চায় ধূতি।
পোতদার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোঁজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরুকেহ নাহি কিনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হৈল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটি যার গাঁ
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামনাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥
ভেটনায় উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ড তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥
বাহিয়া গোড়াই নদী সদাই স্মরিয়ে বিধি
তেউট্যায় হইলু উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি পাইল বাতন-গিরি
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত ॥
নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥
আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈলুঁ কুমুদ-প্রসূনে।

ক্ষুধা-ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লইলা পত্রমসী আপনি কলমে বসি
নানা ছলে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত ॥
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রায় হইলুঁ উপনীত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান ॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশুপাশে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত ॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বরূপ সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।
নিজে দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ ॥
বীর মাধবের সুত রূপগুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ॥

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ডিহিদার মাহমুদ সরিপের অত্যাচারে তিনি সাত পুরুষের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আড়রাগ্রামের পালধি বংশজাত ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে গমন করেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা বাঁকুড়া রায় কবিকে নিজের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জীবিকার সংস্থান করিয়া দেন। বাঁকুড়া রায় অল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করেন, অতঃপর তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রাজা হন। রঘুনাথেরই সভাসদ্‌রূপে বাসকালীন তাঁহার অভিলাষে মুকুন্দরাম তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন,—

রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

মুকুন্দরাম নিজের জীবনে দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া দারিদ্র্য ও দুঃখের কথা যত গভীর এবং মর্মস্পর্শী করিয়া বলিয়াছেন, ঐশ্বর্য কিংবা সুখের কথা তত গভীর ভাবে বলিতে পারেন নাই। সেইজন্য দরিদ্র ব্যাধ ও তাঁহার পত্নীর পারিবারিক জীবনের দুঃখকষ্টের চিত্র তাহার রচনায় বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঐশ্বর্ণশালী সদাগর ধনপতির পারিবারিক জীবনের সম্পদ এবং প্রাচুর্যের কথা তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই, বরং দেখা যায় যে সম্পন্ন পরিবারের জীবনের মধ্যেও তিনি দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভোগের চিত্র আরোপ করিয়া তাহাও প্রায় সেই স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন। ধনপতি সদাগরের পারিবারিক জীবনে আমরা ঐশ্বর্যশালীর জীবনের রূপ দেখি নাই, সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতারই চিত্র দেখিয়াছি। যাহাই হউক, মুকুন্দরাম দুঃখের কথাতেই বড় হইয়া আছেন, সুখের কথায় নহে। ফুল্লরার বারমাসীর মধ্যে যে দরিদ্র জীবনের দুঃখকষ্টের কথা আছে, তাহা আমাদিগকে যত অভিভূত করে, সিংহলের রাজকন্যা সুশীলার বারমাসী তেমন করিতে পারে না।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য এই হিসাবে তাঁহার জীবনেরই কাব্য। তিনি নিজগৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া গৃহ-হারার দুঃখ কি, তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি গুজরাটে নগর পত্তনের বর্ণনা করিতে গিয়া গৃহ-হারা সকলকে তাহার নগরে আসিয়া বসবাস করিবার জন্য উদার আহ্বান জানাইলেন—,

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥

লহনা এবং খুল্লনার সপত্নী বিবাদের মধ্যে হয়ত কবির নিজেরই পারিবারিক জীবনের ছায়াপাত হইয়া থাকিবে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন,

একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর॥

তিনি কালকেতু ব্যাধের কাহিনীতে দুইটি বাঙ্গালী ধূর্ত চরিত্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। একটি বেনে মুরারি শীল, অপরটি সুবিধাবাদী ভাঁড়ু দত্ত।

ধর্মমঙ্গল

মঙ্গলকাব্যের আর একটি ধারার নাম ধর্মমঙ্গল। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার এই নাম। ধর্মঠাকুরের পরিচয়টি খুব স্পষ্ট নহে, কেহ বলেন সূর্য, কেহ বলেন যম, কেহ বলেন বরুণ, কেহ বলেন কূর্ম। যাহাই হউক, তিনি বিষ্ণুর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন, বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ স্থানেই তিনি সূর্য কিংবা বিষ্ণু রূপেই পূজিত হন। তবে মনসা কিংবা চণ্ডীর পূজা যেমন সারা বাংলাদেশে, এমন কি বাংলা দেশের বাহিরেও যেখানে বাঙ্গালী আছে সেখানেই প্রচলিত আছে, ধর্মঠাকুরের পূজা তেমন নহে, তাঁহার পূজা পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ, তবে

তাহার সংলগ্ন অঞ্চলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মঠাকুর দেবী চরিত্র নহেন, তিনি পুরুষ দেবতা, তাঁহাকে অবহেলা করিলে কুষ্ঠরোগ হয়, তিনি পুত্রবর দিয়া থাকেন।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি এই প্রকার—ধর্মপালের পুত্র তখন গৌড়ের রাজা। তাঁহার শ্যালক তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, নাম মহামদ। মহামদ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি, সে অকারণে একজন অনুগত প্রজা সোম ঘোষকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, রাজা তাহাকে মুক্ত করিয়া ত্রিষষ্ঠীর গড়ে পাঠাইয়া দিলেন। ত্রিষষ্ঠীর গড়ে কর্ণসেন নামক একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সোম ঘোষ তাঁহার উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। সোম ঘোষের এক পুত্র ছিল, নাম ইজাই ঘোষ; সে ক্রমে অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠিল; পরিশেষে কর্ণসেনকে গড় হইতে খেদাইয়া দিয়া নিজেই সে গড়ের মালিক হইয়া বসিল। গৌড় হইতে যখন খাজনা হইতে আসিল, তখন রাজকর্মচারীকেও অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। এইবার গৌড়েশ্বর নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া ত্রিষষ্ঠীর গড় আক্রমণ করিলেন। অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইছাই গৌড়ের সৈন্যকে পরাজিত করিল। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল, শোকে রাণী আত্মঘাতিনী হইলেন, শোকে দুঃখে কর্ণসেন পাগল হইয়া গেলেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে পুনরায় সংসারী করিতে চাহিলেন; নিজের একটি সুন্দরী শ্যালিকা ছিল, নাম রঞ্জাবতী; তাহার সহিতই তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। রঞ্জাবতী মহামদ পাত্রের ভগিনী; মহামদের ঐ বিবাহে মত ছিল না বলিয়া রাজা কৌশল করিয়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া দিয়া বিবাহ নির্বাহ করিয়া ফেলিলেন। জানিতে পারিয়া মহামদ ক্রোধে আত্মহারা হইল, রাজার কিছুই করিতে পারিল না বলিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতির উপরই তাহার রাগ গিয়া পড়িল। কিছুদিন না যাইতেই ভগ্নীকে বন্ধ্যা বলিয়া প্রকাশ্যে গালি দিল। রঞ্জাবতী পুত্রলাভের জন্য নানা দেবদেবীর নিকট পূজা মানসিক করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধর্মের নামে শালে ভর দিয়া এক পুত্র লাভ করিলেন, তাহার নাম রাখিলেন লাউসেন।

ক্রমে লাউসেন অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন। গৌড়ে গিয়া গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গৌড়েশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। মহামদ তাঁহার নানা অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না, তিনি নির্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিছু-দিনের মধ্যেই গৌড়েশ্বর তাঁহাকে কামরূপ রাজ্য জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। লাউসেন কামরূপ জয় করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে গৌড়েশ্বর সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়াকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কানড়া লাউসেনকে পতিরূপে কামনা করিয়া আসিয়াছেন, বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে তিনি বিবাহ করিতে চাহিলেন না। তিনি একটি লোহার গণ্ডার নির্মাণ করাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ইহাকে এক কোপে দুই খণ্ড করিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। গৌড়েশ্বর তাহা পারিলেন না, অবশেষে তিনি লাউসেনকে ডাকাইয়া আনিলেন। লাউসেন এক কোপে লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করিলেন, কানড়া তাহাকেই বরমাল্য দান করিলেন। নিরাশ হইয়া গৌড়েশ্বর ফিরিয়া গেলেন।

মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর এইবার লাউসেনকে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে ইছাই ঘোষকে আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। ইছাই ঘোষের পরাক্রমের কথা

কর্ণসেন জানিতেন, সেইজন্য সেই সংবাদ শুনিয়া তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লাউসেন কাহারও কথা শুনিলেন না, রাজাদেশ শিরোধার্য করিয়া ত্রিষণ্টীর গড়ে ইছাই ঘোষকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। অবশেষে ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হইল। গৌড়েশ্বরের শত্রু নির্মূল হইল। বিজয়-গৌরবে লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কোনভাবেই লাউসেনকে অপদস্থ করিতে না পারিয়া মহামদ পাত্র ভাবিল, যে-দেবতার বরে লাউসেন এত শক্তিশালী, সে সেই দেবতার পূজা করিবে। মহামদ গৌড়ে ধর্মপূজা আরম্ভ করিল, কিন্তু ধর্মঠাকুর তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন না, তিনি পূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেন। অকালে গৌড়ে বাদল নামিল। পথঘাট মাঠ সকল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সকল পাপ হইতে রাজাকে মুক্ত করিবার জন্য গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকিলেন। লাউসেন দুশ্চর তপশ্চর্যা দ্বারা ধর্ম-পূজার শ্রেষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ বা সূর্যকে পশ্চিমে উদয় করাইয়া গৌড় রাজ্যকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ লাউ-সেনের রাজধানী ময়নাগড় আক্রমণ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। ধর্মঠাকুরের অভিশাপে সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরিয়া আসিলেন।

ময়ূর ভট্ট

যিনি সর্বপ্রথম ধর্মমঙ্গলের বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম ময়ূর ভট্ট, তিনি দ্বিজ ময়ূর ভট্ট বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পরবর্তী প্রায় সকল ধর্মমঙ্গলের কবিই তাঁহাকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সম্পর্কে কেহ বিস্তৃত পরিচয় দেন নাই, তবে তাঁহাদের উল্লেখ হইতে তাঁহার গ্রন্থের নাম যে 'হাকন্দ পুরাণ' ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলি লিখিয়াছেন---

বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল॥
বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান॥

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার গীতারম্ভে লিখিয়াছেন,

হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূর ভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়।
স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।
ময়ূর ভট্ট বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি॥
ময়ূর ভট্টে বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ধর্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন,

আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছন্দে অনাদ্যের গীত॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল॥

সীতারাম দাস লিখিয়াছেন,

ময়ূর ভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাসে গায় ॥
ময়ূর ভট্ট মহাশয় যোগে নিরমল।
প্রকাশ করিল গীত ধর্মের মঙ্গল ॥
তাহার স্মরণ করি সবে গাই গীত।
সেই অঙ্ক শুনিলে ধর্মেতে যাবে চিত ॥
ময়ূর ভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।
আনন্দে হইল নষ্ট দুই এক কলি ॥

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল হইতে উপরে যে পদ দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার শেষটিতে ময়ূরভট্টের সঙ্গে রূপরাম বলিয়া একজন কবিরও বন্দনা রহিয়াছে। কিন্তু রূপরামও ময়ূরভট্টের পরবর্তী কবি এবং তিনিও যে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজের কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, রূপরামের ধর্মমঙ্গল হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। রূপরাম লিখিয়াছেন, 'ময়ূরভট্টের পদ মনে অনুমানি'। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধর্মমঙ্গলের সকল কবিই তাঁহাদের কাহিনী মূলতঃ ময়ূরভট্টের কাব্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ময়ূরভট্ট কে? তাঁহার পরিচয়ই বা কি?

স্বর্গত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মূল পুঁথি কিংবা তাহার কোনও অনুলিপি পাওয়া যায় না। ১৩০১ সালে লিখিত একখানি মাত্র পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থটি মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক ইহাকেই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইহাতে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবি ময়ূরভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সমসাময়িক। গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করেন, ময়ূরভট্ট খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক।

অতএব দেখা যাইতেছে, ময়ূরভট্টের নাম ও কাব্যকীর্তি যে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—হয় ত কোনও কোনও ধর্মমঙ্গলের কবির কাব্য-মধ্যে তাঁহার রচনাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। নব্য ময়ূরভট্ট তেমনই মূল ময়ূরভট্টের প্রাচীন কোনও অসংলগ্ন কাব্যকাহিনীকে ভিত্তি করিয়া হয়ত তাঁহার নূতন কাব্য গড়িয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে প্রাচীন ময়ূরভট্টের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারের উপায় নাই।

ময়ূরভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোনও কোনও ধর্মমঙ্গলের কবি তাঁহাকে 'দ্বিজ ময়ূরভট্ট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয়, ময়ূরভট্ট কোনও বাঙ্গালী কবির প্রকৃত নাম নহে—সংস্কৃতে 'সূর্যশতক' নামে একটি বই আছে, তাহাতে একশত শ্লোকে সূর্যস্তব করা হইয়াছে, ইহার রচয়িতার নাম ময়ূরভট্ট। এই ময়ূরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙ্গালী কবি গ্রহণ করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, ধর্মঠাকুরের পূজা তখনও নিম্নসমাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণকবি ছদ্মনামের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য এক হিসাবে সূর্যদেবতার মাহাত্ম্যসূচক কাব্য—এই উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত কবির নামটি এখানে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ময়ূরভট্ট নামধারী কবিই ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে ধর্মমঙ্গল রচনার পথপ্রদর্শক। তাঁহারই

দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া পরবর্তী কালে মাণিকরাম, ঘনরাম প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কবি এই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ময়ূরভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ-পুরাণ'। ঘনরাম চক্রবর্তী এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, 'হাকন্দ-পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে'। হাকন্দ-পুরাণ বলিয়া লেখা কোনও কাব্য নাই। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে'র নামও 'হাকন্দ-পুরাণ' নহে। কারণ, 'শূন্যপুরাণে' সূর্যের পশ্চিমোদয়ের কোন কথা নাই, অথচ ঘনরাম উল্লেখ করিয়াছেন,

হাকন্দ-পুরাণে লেখা সাক্ষাৎ আমার দেখা
কলিকালে পশ্চিম উদয়।

লাউসেন যেখানে দেহ নয়খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নামই হাকন্দ; ঘনরাম লিখিয়াছেন,

দিবস দ্বাদশ দণ্ডে হাকন্দেতে নব খণ্ডে
হবে যবে রঞ্জার তনয়।

ময়ূরভট্ট হাকন্দ-কাহিনীর রচয়িতা বলিয়া তাঁহার কাব্যের নামও 'হাকন্দ-পুরাণ'। ময়নাপুর গ্রামে হাকন্দ পোখর নামে এক অতি পুরাতন ও বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বারুণীর সময় ইহার পাড়ে মেলা বসে। যাত্রীরা ইহাতে স্নানের জল পায় না, কাদা জলই মাথায় দেয়। ময়ূরভট্টের বর্ণিত হাকন্দের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে।

আদি রূপরাম

ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম কোন্ কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার উপায় নাই। তবে মাণিক গাঙ্গুলীর কাব্যেই ময়ূরভট্টের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন কবির নামের উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহার নাম রূপরাম। মাণিকরাম তাঁহাকে আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান॥

ইহাতে মনে হয়, মাণিকরামের সমসাময়িককালে কিংবা পূর্বে রূপরাম নামে আরও একজন ধর্মমঙ্গলের কবি বর্তমান ছিলেন; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতর, তাঁহাকেই তিনি আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও বাংলা সাহিত্যে দুইজন রূপরামের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না,—রূপরাম ভণিতায় যে সকল পুঁথি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা একজনেরই বা পরবর্তী রূপরামের রচনা বলিয়া মনে হয়—তথাপি মনে করা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ আদি রূপরামের অনেক রচনা নামসামঞ্জস্য হেতু পরবর্তী রূপরামের নামে চলিয়া গিয়াছে। তবে বর্তমান অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে আদি রূপরামের পরিচয় উদ্ধার করিবার উপায় নাই।

খেলারাম

আদি রূপরামের পর সম্ভবতঃ খেলারাম তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। অবশ্য পরবর্তী কোনও কবি খেলারামের কথা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কাব্যে গ্রন্থ-রচনার কালনির্দেশক যে পদটি পাওয়া যায়, তাহা হইতেই

অনুমিত হয়, তিনি এই বিষয়ে একজন প্রাচীন কবি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে একজন মাত্র তাঁহার পুঁথি দেখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকর্তৃক উদ্ধৃত কয়েকটি পদই খেলারাম সম্পর্কিত আলোচনার একমাত্র ভিত্তি। তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে গ্রন্থরচনার কালসম্বন্ধে এই পদ দুইটি সাধারণত উদ্ধৃত হইয়া থাকে,

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধর্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥

'ভুবন' অর্থে চতুর্দশ, 'বায়ু' ঊনপঞ্চাশ। অতএব দেখা যাইতেছে, ১৪৪৯ শক অর্থাৎ ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের খেলারাম গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। 'শরের বাহন' বলিতে তিনি সম্ভবতঃ কার্তিক মাস মনে করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ মনে করেন, শরের বাহন ধনু অর্থাৎ ইহা পৌষ মাস। খেলারামের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না; তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্মপরিচয়॥

কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষ ভাগ পাওয়া যায় নাই। অতএব ধর্মঠাকুর তাঁহার এই মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছিলেন কি না, তাহাও জানিতে পারা যায় না।

মাণিকরাম

ইহার পরই সম্ভবতঃ মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল রচিত হয়। মাণিকরাম তাঁহার কাব্যমধ্যে গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কালক্রমে লিপিকর-প্রমাদে এত বিকৃত হইয়াছে যে, বর্তমানে ইহা হইতে একটা নির্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা এক প্রকার কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

মাণিকরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঁই পিতা গদাধর।
স্বসাহীন সম্প্রতি ছয় সহোদর॥
দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম।
মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম॥
রামতনু পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ।
সর্বানুজ নয়ন সকল লোকে ধন্য॥
এক কন্যা অভয়া, আখ্যাত অতি ভব্যা।
শান্তমতি সুলক্ষণা সীমন্তিনী সখা॥
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে কাত্যায়নী-সুত।
সত্যগুণে ধর্ম জাগে সদয় সদত॥

কবির পিতামহ অনন্তরাম, প্রপিতামহ সুদাম, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম গোপাল। কবির পিতামহ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের বংশ অত্যন্ত প্রাচীন, তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের বংশ বাঙ্গাল মেল গাঙ্গুলী গাঁই নামে পরিচিত। বেলডিহা গ্রাম কবির জন্মস্থান। গ্রন্থরচনার কারণ সম্বন্ধে কবি এক বিস্তৃত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। কবি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে তর্কশাস্ত্র পড়িতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তুঙ্গারি গ্রামে গমন

করেন। পাঠ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় রাত্রিতে এক দুঃস্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া পর দিবসই 'খুঙ্গি পুঁথি' বাঁধিয়া বাটি রওয়ানা হইলেন। গৃহে ফিরিবার পথে তিনি দৈবক্রমে পথ ভুলিয়া যান। একে দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির তাহাতে আবার পথশ্রমে দেহ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এমন অবস্থায় এক নির্জন মাঠের মধ্যে এক অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ যুবকের মূর্তি ধারণ করিলেন। অতঃপর উভয়ে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবির শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হইলেন এবং কবিকে---

সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হইবে।
অধ্যয়ন করিতে আমার কাছে যাবে ॥
জগতে তোমার যশ হবেক যেরূপে।
সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যের স্বরূপে ॥

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কবি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এমন সময় ধর্মের দুইটি পাদুকা গলায় বাঁধিয়া লইয়া এক ডোম পণ্ডিত আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। কবির নিকট পণ্ডিত এই পথে কোনও ব্রাহ্মণকে যাইতে দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কবি তাহার কোন জবাব দিতে পারিলেন না। পণ্ডিতকে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিত বলিল—,

চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা।
পদতুল্য সম্প্রতি পাদুকা কর সেবা ॥
পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ।
সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ ॥

কবি এই কথার কোনও অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে এক দিব্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। তাহাতে গিয়া কবি তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন, কিন্তু বৃক্ষতলে ফিরিয়া দেখেন, পাদুকা সহ পণ্ডিত অদৃশ্য হইয়াছে। অবশেষে কবি নিজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরিচিত ব্রাহ্মণ কবিকে তাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন—ইহা স্মরণ করিয়া তৃতীয় দিবসে কবি সেই ব্রাহ্মণের নিবাস রঞ্জাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই এক দীঘির তীরে ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এইবার ব্রাহ্মণের মূর্তি বড় ভয়াবহ, হস্তে এক দীর্ঘ যষ্টি, মুখে ক্রুদ্ধ ভাব। কবি দেখিয়া ভয় পাইলেন—

বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্বর।
দস্যুবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি মুনিবর ॥
বুঝি তোর আজি হল বিঘোর মরণ।
এত শুনি মোর হল অঝোর নয়ন ॥

কোনও অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য হয়ত ব্রাহ্মণ তাঁহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া থাকিবেন ভাবিয়া কবি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। এইবার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভয় দিলেন,—বলিলেন, রঞ্জাপুরে আমার গৃহে অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিব। কিন্তু কবি রঞ্জাপুরে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, এমন কোনও ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে নাই। কবি নিরাশ হইয়া স্বগৃহে ফিরিলেন, পথশ্রমে

নিতান্ত কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন, নিদ্রায় অভিভূত হইলে পর অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন, যেন সেই ব্রাহ্মণ শিয়রে আসিয়া বসিয়া বলিতেছেন,—

কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ।
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ॥
গীত রচ ধর্মের গৌরব হবে বাড়া।
নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া॥
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান॥
সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ।
অন্তকালে দিব দুটি অভয় চরণ॥

বাঁকুড়া রায় আরও বলিলেন যে বার দিনে ইহার রচনা সম্পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাঁহার সমূহ বিপদ। তিনি তাঁহার বীজমন্ত্র লিখিয়া দিলেন, ইহাতেই কবির লেখনী হইতে অনর্গল কবিতা বাহির হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। মাণিকরামের চতুর্থ সোদর ছকুরামকে এই গানের গায়েন হইবার জন্য তিনি কবির নিকট বলিয়া গেলেন। এই নির্দেশ মত অগত্যা কবি কাব্যরচনায় মনো-নিবেশ করিলেন। বাধ্য হইয়া কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান ছকুরামকে গায়েন হইয়া আসরে নামিতে হইল।

মাণিকরামের গ্রন্থ অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতই ২৪ পালায় সম্পূর্ণ। প্রথম পালায় কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, ধর্মের বন্দনা, তন্মধ্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্ম-পূজার কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাই ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্থাপন পালা, পরবর্তী আরও ২৩টি পালায় লাউসেনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কাহিনীভাগে দুই এক স্থলে অন্যান্য ধর্মমঙ্গল হইতে একটু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু অন্যত্র প্রায় অভিন্ন। দুই এক স্থলে যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা মাণিকরামের প্রাচীনত্বেরই পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরামের কাব্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্ম পূজার কোনও উল্লেখ নাই, হরিশ্চন্দ্র রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই ধর্মসাহিত্যের প্রাচীনতর উপজীব্য ছিল। লাউসেনের কাহিনী পরবর্তী যোজনা মাত্র। অতএব মাণিকরামের মার্কণ্ড মুনির উল্লেখ হইতেই তাঁহার প্রাচীনত্বের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মাণিক-রামে গৌড়েশ্বরের মাতার নাম সাফুল্লা, ঘনরামে বল্লভা। সাফুল্লা নামটি প্রাচীন-তর। মাণিকরামে লাউসেনের অশ্বের নাম অস্থির পাথর, ঘনরামে আণ্ডির পাথর। আরও কয়েকটি বিষয়ে মাণিকরাম এবং পরবর্তী ধর্ম মঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে সামান্য অনৈক্য রহিয়াছে। এই সকল ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের সময়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান।

মাণিকরাম যে কেবল একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাই নহে—তিনি একজন সুকবিও ছিলেন। ধর্মমঙ্গল বীর-রসাত্মক কাব্য। তাঁহার কাব্যে বীররস ফুটাইয়া তুলিবারজন্য যেমন স্থানে স্থানে ওজস্বিনী ভাষা ও বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই আবার তিনি নিপুণ চিত্রকরের দৃষ্টিদ্বারা সামাজিক চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াসও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তাঁহার রচনা কোথাও ব্যাহত হইয়া পড়ে নাই। তবে সংস্কৃত রচনার আদর্শানুযায়ী তাঁহার রচনায় নানা অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত

সাহিত্য হইতে সংগহীত উপকরণরাশি বাংলা ছন্দের সূত্রেও তিনি এমনভাবে গাঁথিয়াছেন যে, ইহাতেও বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে, তাহা সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত হয় নাই—

কলুষনাশিনী কালরাত্রি করালিনী ।
নৃসিংহনাশিনী নমোস্তুতে নারায়ণী
দক্ষের দুহিতা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
নাগারিবাহিনী নমোস্তুতে নারায়ণী ॥

মাণিকরামের এই সকল রচনা হইতে তাঁহার সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার নিজের সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইতে পারে—

অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল ॥
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্ক শাস্ত্র ॥
ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপর।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বচ্ছর ॥

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে কবি জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচুর রসও আহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মাণিকরামের কবিকল্পনায় চরিত্রসৃষ্টিও কতকটা সার্থক হইয়াছে। লখ্যাডোমনীর চরিত্র তাঁহার কাব্যে এক অতি অপূর্ব সৃষ্টি। আদিরস বর্ণনায় মাণিকরাম অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কবিদিগের তুলনায় একটু বিশেষ অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও তাঁহার সংস্কৃত রসশাস্ত্র অনুশীলনের ফলই বলিতে হইবে।

রূপরাম

সম্ভবতঃ মাণিকরামের সমসাময়িক কালেই দ্বিতীয় রূপরাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু মাণিকরামের কাব্যের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। রূপরামের গ্রন্থ রচনার কাল ১৫১২ শকাব্দ বা ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ। রূপরামের কাব্যের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল, সেই জন্য ভাষা হইতে তাঁহার কালনিরূপণ অসম্ভব, তবে ভাষার বিচারেও তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক হইতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

কবিকঙ্কণ মকুন্দরামের জন্মস্থানের অনতিদূরবর্তী বর্ধমান জিলার অন্তর্গত রায়না থানার এলাকায় কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন, শতাধিক ছাত্র তাঁহার গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। রূপরামের আর তিন সহোদর ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম রত্নেশ্বর, তিনি রূপরামের লেখাপড়ায় ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সর্বদা ভর্ৎসনা করিতেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া রূপরাম খুঙ্গি পুঁথি লইয়া পাঠাভ্যাসের জন্য কবিচন্দ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে আসিয়া ভর্তি হইলেন। রূপরাম অত্যন্ত দুর্বিনীত ছাত্র ছিলেন, গুরুর সঙ্গে একদিন বচসা আরম্ভ করিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরু তাঁহাকে এক ঘা পুঁথির বাড়ি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। রূপরাম

নবদ্বীপে বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের টোলে পড়িতে চলিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে জননীর কথা মনে হওয়ায় গৃহের দিকে ফিরিলেন। রূপরাম তাঁহার আত্মবিবরণী ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণে লিখিয়াছেন, এই সময়েই ধর্মঠাকুর পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন,—

সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল॥
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর॥
আমি ধর্ম ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম॥
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজে বুলি।

পথিমধ্যে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া কবির 'তরাসে কাঁপিল তনু পরাণ।' তিনি ঊর্ধ্ব শ্বাসে দৌড়াইয়া একেবারে নিজের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর পুনরায় গর্জন আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, 'কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে।' রূপরাম পুনরায় গৃহত্যাগ করিলেন, নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গোপভূমের রাজা গণেশের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়া গানের দল বাঁধিয়া দিলেন। রূপরাম বলিয়াছেন, 'সেই হত্যে গীত গাই ধর্মের আসরে'; পাঠে আর মনঃসংযোগ করেন নাই। রূপরাম সর্বত্র নিজেকে 'দ্বিজ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেই যুগে ব্রাহ্মণগণ এই বৃত্তি গ্রহণ করিলে সমাজে পতিত হইতেন, সম্ভবতঃ তিনিও পতিত হইয়াছিলেন। গোপভূমের রাজা গণেশ কবে বর্তমান ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই; তাহা হইলেও কবির কাল-নিরূপণের অনেকটা সাহায্য হইত।

মাণিক গাঙ্গুলী রূপরামকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলে রূপরামের সহিত মাণিকরামের যে অংশে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ আদি রূপরামেরই রচনা, তাহা মাণিকরামের কাব্যেও যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, পরবর্তী রূপরামের কাব্যেও সেইভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। উভয় কবির ইছাই বধ পালাটি প্রায় অভিন্ন, এই জন্য অবশ্য মাণিকরামই রূপরামের নিকট ঋণী, না উভয় কবিই তাঁহাদের পর্ববর্তী ময়ূরভট্টের কাব্য এইভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ময়ূরভট্টের পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাহা বলিবার উপায় নাই।

ভট্টাচার্যের টোলে অধ্যয়ন শেষ না করিলেও রূপরাম যে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই প্রকাশ পায়। জামতি পালায় কুলটা নয়ানীর রূপ-সজ্জার যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে—

কপালে সিন্দূর পরে তপন-উদয়।
চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়॥
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ॥
এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণযুতা।
আনন্দ অম্বুদকুলে বিজুরীর লতা॥

মধ্যে মধ্যে রূপরামের রচনায় এই প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় তাঁহার কাব্যমধ্যে সুলভ নহে। অন্যত্র প্রায়ই তাঁহার বর্ণনা সরল, রচনাও মধ্যে মধ্যে শ্রুতি-মধুর। কাহিনী বর্ণনা করিবার একটি সহজ ভঙ্গিমা তাঁহার ছিল।

কাব্যগুণ

এইবার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের চরিত্র-সৃষ্টির মধ্য দিয়া কি কাব্যগুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা যাইবে।

মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগর চরিত্রের মত এমন সমুন্নত পুরুষকারের আদর্শ সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আদর্শেই পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের দেববিদ্রোহী নায়কদিগের চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর চাঁদ সদাগরেরই অনুকরণে সৃষ্ট চরিত্র। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতিও চাঁদ সদাগরের প্রতিধ্বনি করিয়া চণ্ডীর সম্বন্ধে অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিলেন,

> যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
> মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি ॥

শীতলা-মঙ্গলের শৈব রাজা চন্দ্রকেতু চাঁদ সদাগরের আদর্শেই শীতলার প্রতি অবজ্ঞাসূচক অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন,

> রাজা বলেন শীতলা করেছে যদি বাদ।
> কদাচিৎ আমি তার না ল'ব প্রসাদ ॥

অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, পরবর্তী প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যই তাহাদের নায়ক চরিত্র পরিকল্পনার জন্য মুখ্যতঃ মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর নায়ক চাঁদ সদাগরের নিকট গভীরভাবে ঋণী; এই বিষয়ে তাঁহাদের নিজস্ব প্রায় কোনই মৌলিকতা নাই; তৎকালীন বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর ব্যাপক প্রভাবেরই ইহা প্রমাণ।

বাংলার মধ্যযুগের অতীত অন্ধকারের মধ্যে কর্ণপাত করিয়া থাকিলে যে একটিমাত্র চরিত্রের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এই চাঁদ সদাগরের। যে যুগে দৈবানুগ্রহই জাতির জীবনে পরম প্রসাদ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই যুগে দৈবানুগ্রহকেই সকল প্রকারে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র নিজের পুরুষকারের উপর এই চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রতি প্রত্যেকেরই সুগভীর সহানুভূতি প্রথম সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই সমাজ চিরদিনই আদর্শবাদী, অন্তরের আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সংসারের কোনও বিপদকেই ইহা কোনদিন বিপদ বলিয়া মনে করে নাই। নিজস্ব আদর্শের উপাসনায় লাঞ্ছিত চাঁদ সদাগর চিরলাঞ্ছিত আদর্শ-পূজারী এই সমাজের যেন মূর্ত প্রতীক্। সেইজন্য চাঁদ দেব-বিদ্রোহী চরিত্র হইয়াও সাধারণ জনসমাজের শ্রদ্ধা হইতে কোনদিন বঞ্চিত হন নাই। সকলেই চাহিয়াছে, তাঁহার এই লাঞ্ছনার অবসান হউক, ধনে পুত্রে সুখী হইয়া পুনরায় তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত হউন, তাঁহার নিজের আদর্শের প্রতি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্য দুঃখের ভিতর দিয়াই যেন তাঁহার জীবন শেষ না হয়।

কিন্তু চাঁদ সদাগরকে আদর্শের পূজারী বলিয়া অঙ্কিত করিতে গিয়া মনসা মঙ্গলের কবিগণ কি তাঁহাকে রক্তমাংসের সম্পর্কহীন করিয়া কল্পনা করিয়াছেন?

যদি তাহাই হয়, তবে এই চরিত্র পরিকল্পনার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু এই বিষয়েও আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদকে যথার্থ রক্তমাংসের মানুষরূপেই মনসা-মঙ্গলের কবিগণ চিত্রিত করিয়াছেন, মানবিক সুখ-দুঃখ-আশা-নৈরাশ্য দ্বারাই তাঁহার হৃদয় মথিত হইয়াছে। লখিন্দরের মৃত্যুর পর এই একটি মাত্র কথায় মনসা-মঙ্গলের একজন কবি সন্তান-শোকাতুর পিতৃহৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,—'স্তব্ধ প্রায় হৈল সাধু নাহি বোলচাল।' সাংসারিক ঝড়-ঝঞ্ঝায় অবিচল-চিত্ত চাঁদ সদাগরের তৎকালীন মনের অবস্থা ইহা অপেক্ষা সার্থকভাবে বোধ হয় বর্ণনা করা অসম্ভব হইত। চৈতন্যের গৃহত্যাগের পর বৃন্দাবন দাস শচীদেবী সম্বন্ধে ও এমনই সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেন,—'পৃথিবী স্বরূপা হইলা শচী জগন্মাতা।' যেখানে অনুভূতি সুগভীর সেখানে বেদনাবোধও বিমূঢ় হইয়া যায়। যে অমিত তেজস্বিতা দ্বারা চাঁদ সদাগর নিজের আদর্শগত নিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই তিনি এই লৌকিক পুত্রশোক জয় করিয়া লইলেন,

> স্বভাবে বৈষ্ণব সাধু যোগমন্ত্র জানে।
> কারণ জানিয়া শোক পাশরিল মনে॥

কাব্যের উপসংহারে চাঁদ সদাগরের যে পরাজয় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মানুষের নিকটই মানুষের পরাজয়—দুঃখিনী পুত্রবধূর নিকট স্নেহশীল এক পিতৃতুল্য হৃদয়ের নির্বিচার আত্মসমর্পণ। ইহা রক্তমাংস গঠিত মানুষেরই দুর্বলতার পরিচায়ক। সেইজন্য আদর্শবাদী হইয়াও চাঁদ ধরণীর ধূলিমাটির স্পর্শ হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। ইহাই চাঁদ চরিত্রের সার্থকতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আর একটি বড় সুন্দর সার্থকতা রহিয়াছে। একদিকে তাঁহার সুদৃঢ় চরিত্র ও অপর দিকে সনকা-বেহুলার সকরুণ চিত্র—ইহাদের পরস্পর বিপরীতমুখী আদর্শের সংঘাতে মনসা-মঙ্গল কাব্য এক অপূর্ব রসরূপ লাভ করিয়াছে,—বৈচিত্র্যহীন করুণরসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ হইয়া উঠে নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন বাংলা কাব্যেও 'নায়িকারই প্রাধান্য' দাবী করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে কেবল ফুল্লরা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণু মাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।' কিন্তু মনসা-মঙ্গলের নায়ক চাঁদ সদাগর সম্পর্কে এই উক্তি প্রযোজ্য নহে। এমন কি, মনসা-মঙ্গলের নারী-চরিত্রগুলিও কেবল যে নিজেরাই নড়িয়া বেড়ায়, তাহাই নহে—পাঠকের চিত্তকেও নাড়া দিয়া যায়। আর চাঁদ সদাগরের ত কথাই নাই।

আদর্শবাদী সমাজের অন্যতম আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি বেহুলা। বেহুলা একাধারে রামায়ণের সীতা ও মহাভারতের সাবিত্রী,—দুঃখ-সহনশীলতায় সে সীতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিবার শক্তিতে সে সাবিত্রী। আমাদের সমাজের যে নিয়ম তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার দুঃখের ভাগটা অধিকাংশই নারীর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীরবে সকল দুঃখ সহ্য করিবার শক্তিও এই নারীজাতির অসীম; সেইজন্য কোনও ব্যবস্থাই সে কোনদিনই মাথা পাতিয়া লইতে অস্বীকার করে নাই, কোনও ব্যবস্থার জন্য তাহার কোনদিন কোনও প্রতিবাদও করিতে শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেহুলার চরিত্রের মধ্যে এমন একটি গুণের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় যে, এই

নিয়মানুবর্তিতার মূলে তাহারও একটু বিদ্রোহের ভাব সুপ্ত রহিয়াছে। বিবাহ রাত্রেই লখিন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে পুত্র-শোকাতুরা সনকা বেহুলাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বেহুলা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিল,

নাগিনী দংশিল প্রভু মোরে কর রোষ।
তোমার ছয় পুত্র মৈল সেও কি আমার দোষ॥

শোকোন্মত্তা জননী পুত্রের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূর দুর্ভাগ্যকে বারবার দায়ী করিতে লাগিলেন, তাহার বাক্যে বেহুলা অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়াও বাহিরে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিল,—

সোনেকার বচনে বেহুলা কোপে জ্বলে।
যোড় হাত করিয়া শাশুড়ীর আগে বলে॥
পাপ কর্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী।
বিয়ার রাত্রে মৈল স্বামী হৈলাম কাঁচা রাণ্ডী॥
অভাগিনী বেহুলারে মাতা কেন কর রোষ।
কর্মদোষে মইল প্রভু নহে মোর দোষ॥

তারপর মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া বেহুলা যখন গাঙ্গুরের স্রোতে এক অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিল, তখন সনকা তাঁহার সকল রোষ ভুলিয়া তাহাকে গৃহে ফিরিতে বলিলেন; সনকার নিকট বেহুলা তখন আর তাঁহার পুত্রবধূ নহে, ব্যথিত মানবাত্মার প্রতীক মাত্র; তখন তাহার প্রতিও তাঁহার সে সহানুভতি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা ব্যথিত মানবতার প্রতি শাশ্বত মানবতার চিরন্তন সহানুভূতিরই অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ভাইয়েরা সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘরে ফিরিতে বলিল; বেহুলা কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত করিল না। কাহারও কোনও অনুনয়, বিনয় ও স্নেহানুরোধ তাহাকে তাহার লক্ষ্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। লৌকিক আকর্ষণ অপেক্ষা একটা অনির্দিষ্ট আদর্শের আকর্ষণই তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিল এবং তাহার উপরই তাহার জগজ্জয়ী সতীত্বেরও প্রতিষ্ঠা হইল। আজ যদি বেহুলা শাশুড়ী ও ভ্রাতার নির্দেশ মত সমাজের সাধারণ নিয়মানুযায়ী মৃত স্বামীর সৎকার করিয়া আসিয়া সমাজের আরও দশজন বিধবার মতই পরম নিষ্ঠার সহিত তাহার অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া যাইত, তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহার সতীত্বের এই দীপ্তি প্রকাশ পাইত? কিন্তু আজ সে যে এই সমাজ-নির্দেশেরই প্রতিবাদ করিয়া পরিস্ফুট যৌবনেও মৃত স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া নির্মম মত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চলিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রকৃত গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। বেহুলার দুঃখ-সহনশীলতা অপেক্ষাও তাহার নির্ভীক তেজস্বিতাই যেন সকলের মন অধিক আকৃষ্ট করে। সহনশীলতা নারীর ধর্ম। ছয় অকাল-বিধবা পুত্রবধূর গভীর মৌন বেদনা চাঁদ সদাগরের সংসারকে স্তব্ধ শ্মশানের মত নিত্য নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। বেহুলা চাঁদ সদাগরের সংসারে যেন এই গতানুগতিক দুঃখ-সহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আসিল।

নির্মম মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অসীম শক্তি লইয়াই যেন সে চাঁদ সদাগরের সংসারে পদার্পণ করিল। অত্যাচার অবিচার নীরবে মাথা পাতিয়া বহন করিয়া যাওয়াও কাপুরুষতা; আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে জানে, সে-ই সংসারে প্রকৃত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। দৈবশক্তি বেহুলার একাগ্র সাধনার নিকট যেন মাথা নত করিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু কেবলমাত্র আদর্শবাদের উপরই বেহুলা-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা নয়, ইহার মধ্যে মানবিক অনুভূতির স্পর্শও অনুভব করা যায়। লখিন্দরের মত্যুর পর চাঁদ সদাগর যখন বেহুলার নিকট জানিতে চাহিলেন,—

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাসা কর কি আছে সাহস।
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ॥

তখন,

শ্বশুরের কথায় বেহুলার প্রাণে লাগে ভয়।
হস্ত যোড় করিয়া শ্বশুরের আগে কয়॥
বেহুলা বলে শ্বশুর তুমি দেবতা সমান।
অভাগিনী বেহুলার কথা কর অবধান॥
পূর্বকালের কথা কহিছে বুড়া বুড়ী।
সর্পাঘাতে মৈলে লোকে অগ্নিতে না পুড়ি॥
কলার মাঞ্জুষে করি ভাসাও গাঙ্গরী।
আমি অভাগিনী যাব প্রভুর সংহতি।

নির্মম সমাজের হৃদয়হীন ভ্রূকুটির সম্মুখে অসহায়া বালিকার এই কাতর প্রার্থনা কী করুণ! ইহার মধ্যেও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেহুলার প্রতিবাদের সুর প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। শ্বশুরের এই কথার পর তাহার নদীর জলে ডুবিয়া মরা ছাড়া আর কি সহজ উপায় ছিল। তাহার স্বর্গের পথে ভাসান যাত্রা জলে ডুবিয়া মৃত্যুর রূপক ছাড়া আর কি?

মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাস্তব চরিত্রই সনকার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুইটি জননী-চরিত্র অনবদ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটি লখিন্দর-জননী সনকা, আর একটি উমা-জননী মেনকা। ইহাদের সঙ্গে যদি চৈতন্য-জননী শচীমাতার চরিত্রটি আনিয়া যোগ করা যায়, তাহা হইলেই চিত্রটি পরিপূর্ণ হয়। এই চরিত্র কয়টি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যযুগের বাংলার কবিদিগের আদর্শনিষ্ঠা যত উচ্চাঙ্গেরই হউক, বাস্তব অনুভূতিও তাহা অপেক্ষা তাঁহাদের কোনও অংশেই কম ছিল না। জননী-চরিত্র পরিকল্পনায় এদেশের কবিগণ বাংলার গৃহাঙ্গিনার বাস্তব পরিবেশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

ছয় বিধবা পুত্রবধূ ও দেবদ্রোহী স্বামী লইয়া সনকার নিত্য সংসার, দুঃখের মধ্যে দৈবের নিকট যে সান্ত্বনা সন্ধান করিবে তাহারও উপায় নাই। এই নারীর তাহা হইলে অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার স্থান কোথায়? স্বামী সুখ-দুঃখে নির্বিকার, কিন্তু তিনি নারী, তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃই মানবিক দুঃখ-বেদনার অধীন।- তাঁহার দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাঁহার গর্ভে অভিশপ্ত সপ্তম পুত্র লখিন্দর জন্মগ্রহণ করিল। এই পুত্রের বিবাহের দিনই তাঁহার জীবনের চরম দুঃখ লেখা ছিল। পুত্র-পুত্রবধূকে বরণ করিয়া লইবার মুহূর্তে আকাশের কোন অদৃশ্য কোণ হইতে এক নিদারুণ বজ্রাঘাত তাঁহার উপর পতিত হইল। সনকা চিরসন্তান-দুঃখিনী, কিন্তু এমন কঠিন দুঃখও কি তাহার সহ্য করিতে বাকি ছিল? ইহাও কি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে?

কি শুনালে সখীগণ শুনাও আরবার।
সত্য কি মরেছে আমার বাছা লক্ষীন্দর॥

আলুথালু চুলে ধায় পাগলিনীর বেশে।
ত্বরিতে চলিয়া গেল বাসরের পাশে॥

তারপর তাঁহার সে কি পুত্র-শোকোন্মাদিনী মূর্তি,—

কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়॥

পুত্র-শোকাতুরা বাঙ্গালী জননী তারপর স্বভাবতঃই পুত্রের দুর্ভাগ্যের জন্য সদ্যবিবাহিতা পুত্রবধূকে দায়ী করিলেন,—

সোনা বলে বধূ তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী॥

তারপর যখন অভিমানিনী বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া গাঙ্গুরের জলে ভাসিল, তখন তাহার জন্য সনকার মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—

সোনা বলে বধূ তুমি আমার কথা রাখ।
লখাইর বদলে মোরে মা বলিয়া ডাক॥

কিন্তু অবিচলিত বেহুলা যখন তাঁহার নিকট চারিটি নিদর্শন রাখিয়া যাত্রার জন্য উদ্যত হইল, তখন সনকা মাতৃহৃদয়ের স্নেহোচ্ছ্বাস আর রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না; এই স্নেহগুণেই পরের গর্ভজাত সন্তানকে বাংলার মায়েরা আপনার সন্তানের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া থাকেন,—

যত্ন করি সোনেকো রাখিল নিদর্শন।
বেহুলারে কোলে করি যুড়িল ক্রন্দন॥
ধারা শ্রাবণের হেন চক্ষে বহে পানী।
চরণে পড়িয়া বেহুলা মাগিল মেলানি॥

চক্ষের পলকে মাঞ্জষ গাঙ্গুরের স্রোতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন নিজের শূন্য সংসারের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সনকা কী মর্মভেদী আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন,

তোমারে বিদায় দিয়া খাড়া হইয়া চাই।
মা বলিয়া কে ডাকিবে হেন লক্ষ্য নাই॥

এই রিক্তা জননীর একটি সকরুণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস মনসা-মঙ্গলের সমগ্র কাহিনীটিকে করুণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই করুণ বিয়োগাত্মক কাব্যের চরম অভিশপ্ত চরিত্র লখিন্দর। সে এই কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত, অথচ তাহাকে লইয়াই কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে কোনদিন সে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই,—জননীর সতর্ক স্নেহ-দৃষ্টির ছায়ায় তাহার জীবন অলক্ষ্যগোচর রহিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ একটি দিনের জন্য সে কাহিনীর নায়ক হইয়া উঠিয়াছিল —সেদিন তাহার পরম ও চরম দিন—সেই দিনই তাহার বিবাহ ও তাহার মৃত্যু। অমলিন বরসজ্জা লইয়া সেদিন সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল। তাহার মুখ হইতে একবার মাত্র যে কথা বলিতে শুনিলাম, তাহাও তাহার মৃত্যুযন্ত্রণার করুণ আর্তনাদ,,—

ওঠ ওঠ প্রাণেশ্বরি কত নিদ্রা যাও।
মোক খাইল কালনাগে চক্ষু মেলি চাও॥

একটি উন্মথ জীবন অকস্মাৎ ছিন্নমূল তরুর মত ধূলিতে লটাইয়া পড়িল—অতৃপ্তির একটি সুগভীর হতাশা লইয়া সে এক উৎসব-দীপালোকিত জনকোলাহল-পূর্ণ রাজপুরী হইতে বিদায় লইল—তারপর এই বিয়োগান্তক কাব্যের করুণ

কাহিনীর উপলক্ষটুকু মাত্র হইয়া শ্মশানের দগ্ধ অঙ্গারের মত ইহার এক প্রান্তে পড়িয়া রহিল।

এইবার চণ্ডীমঙ্গলের কথা বলি। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কালকেতু ব্যাধের কাহিনীর নায়িকা ফুল্লরা।

ফুল্লরার পরিচয়, সে 'কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পশরা।' মৃগয়াজীবী ব্যাধের পত্নীর ইহা অপেক্ষা আর উল্লেখযোগ্য গুণ কিছুই থাকিতে পারে না। তাহার নামটিও ফল্লরা, অর্থাৎ ফুল্ল বা স্পষ্ট রাবারাব কন্ঠস্বর যাহার। মাথায় লইয়া পসরা করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে হয়, সেইজন্য পসারিণীর ফুল্লরা বা সুস্পষ্ট কন্ঠস্বরের প্রয়োজন। তাহার তাহা ছিল বলিয়াই সে ফুল্লরা। বাংলার কোন্ অজ্ঞাত পল্লীকবি তাঁহার পসারিণী নায়িকার এই অপূর্ব সার্থক নামটি রাখিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ব্যাধ-পত্নীর গুণটির উল্লেখের পরিবর্তে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রানুমোদিত যে এখানে তাহার এক বিস্তৃত রূপ-বর্ণনার অবতারণা করেন নাই, তাহা তাঁহাদের এই চরিত্রটি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক বলিতে হইবে। কারণ, সে অনার্য ব্যাধের পত্নী, রূপের কথা তাহার আসেই না, তাহার শুধু গুণের কথা। সেই গুণের প্রধান গুণই হইতেছে যে, সে বুদ্ধিমতী পসারিণী; ইহা দ্বারাই তাহার জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। অনার্য ব্যাধ-পত্নীকে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ নিজেদের অন্তরের মমতা দিয়া গড়িয়াছেন, তাহার মধ্যেও স্বাভাবিক মানবিক স্নেহমমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকে কিছু একটা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন নাই। সে ব্যাধ স্বামীর উপযুক্ত পত্নী, বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতিও তাহার সেবাযত্নের ত্রুটি নাই, তাহারা তাহাকে বধূরূপে পাইয়া তাহাদের জীবন সার্থক বলিয়া বিবেচনা করে। শাশুরীর মৃত্যুর পর ফুল্লরা এই ক্ষুদ্র সংসারখানির গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা হইল। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সাংসারিক কর্তব্য পালনের ভিতর দিয়া তাহার জীবন কাটিতে লাগিল।

সংসারে নিত্য অভাব,—স্বামী যেদিন শূন্যহাতে বন হইতে ফিরিয়া আসে, সেদিন উপবাস; ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তায় লতাপাতার ছাউনী,—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খরা মাথার উপর দিয়া যায়, একখানি খুঞার বসন মাথায় আঁটিয়া পরিবার মত নাই, বর্ষার ধারা মাথায় ধরিতে হয়,—এইভাবে শীত ও বসন্ত কাটে। কিন্তু দিনের পর দিন এই সব সহিয়া যায়, ইহাকেও কোন দিন দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। যেদিন ছলনাময়ী চণ্ডী তাহার গৃহাঙ্গিনায় আসিয়া মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলেন, সেই দিনই ফুল্লরার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখের দিন। স্বামীর প্রতি তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আর বুঝি রক্ষা পায় না। অথচ এমন নিষ্ঠুর সত্যকেই বা কি ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়! সে উর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে গোলাহাটে গিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। কালকেতু দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, এমন ত আর কোনদিন দেখে নাই; সে জিজ্ঞাসা করিল,

> শাশুড়ী ননদী নাই, নাই তোর সতা।
> কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥

শাশুড়ী ননদীই বাঙ্গালী বধূর সংসারের জ্বালা, তাহারাই যদি ফুল্লরার নাই, তবে কে তাহাকে কাঁদাইল? ফুল্লরার কান্না কালকেতুর বিস্ময়। তাহাদের

দাম্পত্য জীবনের পরম শান্তির ইহা অপেক্ষা আর কি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকিতে পারে?

তারপর চণ্ডী আবির্ভূত হইয়া যখন কালকেতুকে একটি মূল্যবান অঙ্গুরী দান করিলেন,

বীর হস্তে দিল দেবী মাণিক অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী॥
এক গোটা অঙ্গুরীতে হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥

কিন্তু চণ্ডী এ'কথা বলা সত্ত্বেও যে, 'এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা', তথাপি 'ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা।' ধনে যেন তাহার কেমন অনাসক্তি, বিশেষতঃ এক যুবতীর হাত হইতে যখন তাহার স্বামী এই ধন পাইতেছে, তখন কে জানে ইহাতে কি আছে? দেবতার মাহাত্ম্য ত সে বুঝে না, বুঝিবার কথাও নহে। দেবতা ত এতদিন পর্যন্ত তাহার জীবনে এতটুকুও প্রসাদ দান করিলেন না; দুঃখের বারমাসীই যাহার জীবন-সঙ্গীত, সে কি করিয়া আজ অকস্মাৎ এই অকারণ দেবতার প্রসাদ লাভ করিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ হইয়া উঠিতে পারে? সে অনার্য ব্যাধ-বধূ, দেবতার প্রতি তাহার ভক্তি নাই, আছে অবিশ্বাস; সেইজন্য আকস্মিক দৈবানুগ্রহকে সে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া গ্রহণ করিতে পারিল না।

ধনপতির কাহিনীতে খুল্লনার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। জীবনের কঠোরতম দুঃখের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াও সে তাহার স্বামি-প্রেম মুহূর্তের জন্যও ম্লান হইতে দেয় নাই। পরকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই যেন এই চরিত্রটির ধর্ম। সেইজন্য স্বামীর প্রেমে তাহার যত বিশ্বাস, দাসীকর্তৃক প্ররোচিত সপত্নীর কথায়ও তাহার তেমনই বিশ্বাস। আত্মশক্তি যেখানে দুর্বল, দেবতায় বিশ্বাস সেখানে স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির তাড়নায় খুল্লনা কোন কার্যেই আত্মনিয়োগ করে না; আত্মশক্তিতে সে বিশ্বাস করে না, সেইজন্যই সর্বতোভাবেই দেবতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। খুল্লনার চরিত্রে পদ্মাপুরাণের বেহুলা-চরিত্রের একটু প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়।

লহনার চরিত্রটিও সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। সরল বিশ্বাস ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহারও কোনও অংশেই কম নহে। এমন কি, স্বামীর কথায় সপত্নীকেও পর্যন্ত সে গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দাসী দুর্বলা যখন তাহাকে সপত্নীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া দিল, তখন তাহার মনে স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। উদার সংস্কার দ্বারা তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি মার্জ্জিত ছিল না বলিয়াই, সে সামান্য দাসীর প্ররোচনায় অসহায় একটা বালিকার এমন দুঃখের কারণ হইয়া পড়িল। একবার বিদ্বেষবহ্নিতে আহুতি পড়িলে, তাহা আর নির্বাপিত করা যায় না, অন্ততঃ তাহা করিবার মত মানসিক শিক্ষা লহনার মত চরিত্রের ছিল না। সেইজন্য খুল্লনার প্রতি তাহার ব্যবহার আর কোনও পরিবর্তন হইল না।

পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে কালকেতুর চরিত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে। ব্যাধ-জীবনোচিত সংস্কার একদিক দিয়া যেমন তাহার প্রবল, তেমনই আদর্শ সামাজিক চরিত্র হইবার উপযুক্ততারও তাহার অভাব নাই। তাহার নৈতিক জ্ঞান অত্যন্ত

সূক্ষ্ম, সামাজিক বিচার ন্যায্য, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অপরিমেয় ও পত্নীর প্রতি তাহার প্রেম কর্তব্যের সংযম দ্বারা শাসিত। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ এই চরিত্রটিকে রাজসিংহাসনারূঢ় ও রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া শেষকালে একেবারে হত্যা করিয়াছেন, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভাঁড়ু দত্ত ধূর্ততার প্রতীক। একান্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাহাকে ধূর্ততার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক কার্যেই তাহার স্বার্থপরতার উদ্দেশ্য বাহিরের লোকের নিকট এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত যে, সে পদে পদে ধরা পড়িয়া গিয়া তাহার জন্য নির্যাতন ভোগ করিত। তাহার সংসারে নিত্য অসচ্ছলতা, অন্তরে কদর্যতা, কিন্তু তাহা গোপন করিবার জন্য বাহিরে 'ফোঁটাকাটা মহাদম্ভ গর্ব করিবার একমাত্র বিষয় তাহার কুল,

ঘোষ বসুর কন্যা দুই জায়া মোর ধন্যা
মিত্রে কৈলুঁ কন্যা সমর্পণ।

সে কালকেতুর মন্ত্রী হইবার প্রত্যাশী হইয়া তাহার নিকট গেল। সরল প্রকৃতির কালকেতু তাহার মত ধূর্ত ব্যক্তির ছলনা বুঝিতে না পারিয়া তাহার আবেদন মঞ্জুর করিল। কিন্তু স্বভাবদুর্বৃত্ত ভাঁড়ু উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াও নিজের প্রকৃতি ভুলিতে পারিল না। কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুর নামে প্রজাগণ আসিয়া দলে দলে অভিযোগ করিতে লাগিল। তাহার কি অপরাধ?—'টাকা সিকা নিত্য খায় ধুতি।' হাটুরিয়া লোকের নিকট হইতে সামান্য ঘুষ খায়, অন্যায্য ভাবে তোলা দাবী করে, না দিলে তাহাদের উপর অত্যাচার করে। টাকা ভাঙ্গাইয়া পরে কড়ি দিবে বলিয়া বিনামূল্যে পসরা করিয়া বেড়ায়। ভাঁড়ুর প্রকৃতি যেমন নীচ, তাহার দৃষ্টিও তেমনই নীচ—সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ লোকের সঙ্গে বিবাদ বাঁধাইয়া দেয়। রাজার মন্ত্রী হইবার মত তাহার উচ্চ গুণ নাই। সেইজন্য কালকেতু তাহাকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিল, 'আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব'। ভাঁড়ু চরম অপমান বোধ করিল, বিশেষতঃ তাহার স্বার্থসিদ্ধির পথ বন্ধ হইয়া গেল দেখিয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। লোভ, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা —তাহার মধ্যে কোন দুর্গুণেরই অভাব ছিল না। এইবার এই অপমানের জন্য সে কালকেতুর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। সে কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চলিল। কলিঙ্গরাজ ভাঁড়ুর প্রদর্শিত পথে কালকেতুর রাজধানী গুজরাট আক্রমণে করিলেন, পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া ভাঁড় সরলা ফুল্লরার নিকট হইতে কালকেতুর সন্ধান জানিয়া তাহা শত্রুপক্ষের কোটালকে জানাইল। কাল-কেতু বন্দী হইল। কিন্তু দেবীর অনুগ্রহে সে মুক্তিলাভ করিয়া যখন নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিল, তখন ভাঁড় পুনরায় কালকেতুর সম্মুখে আবির্ভূত হইল; তাহার চিরাচরিত কপটতা অবলম্বন করিয়াই বলিল,

যে জন আপন সেই কভু পর নয়
আপন জানিবে ভাঁড়ু দত্তে।

সে-ই যে কলিঙ্গরাজকে বলিয়া কি ভাবে কালকেতুর মুক্তিবিধান করিয়াছে, বার বার তাহাই বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার আচার ও ব্যবহারের মধ্যেই তাহার প্রকৃতি এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহা সরল ব্যাধ-সন্তানেরও দৃষ্টি এড়াইল না। কালকেতু বলিল, 'ভাঁড়ুরে, নিজ দোষে খোয়ালে আপনা'। বলিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিল।

নীচ, স্বার্থান্বেষী, অকৃতজ্ঞ, ধূর্ত, খল একটি চরিত্র হিসাবে ভাঁড়ু দত্ত চণ্ডী-মঙ্গলের কবিদিগের একটি সার্থক সৃষ্টি। বিশেষ কাল ও বিশেষ সমাজের স্বাতন্ত্র্যও বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা চিরন্তন মানব-চরিত্রের বিশেষ একটা দিকের পরিচয় ইহাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুরূপ পরিবেশে সর্বদেশে সর্বকালেই সম্ভব হইতে পারে। মানব-মনের স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে এখানে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অপূর্ব কৌশলে প্রকাশ করা হইয়াছে। মধ্যযুগের দেবমহিমা-মূলক কাব্যরচনার মধ্যেও যে প্রকৃত মানব-চরিত্র সম্পর্কে কবিদিগের দৃষ্টি কত সজাগ ছিল, এই চরিত্রটি তাহার প্রমাণ।

রাঢ়ের জাতীয় স্ত্রীচরিত্র-পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সম্পর্কে প্রথমেই কানড়ার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। কানড়া বীর রমণী। গৌড়েশ্বরের আক্রমণে পিতা সপরিবারে দুর্গত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু সে যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল। বাঙ্গালী নারীর ইহা এক অভিনব পরিচয়। এই চিত্রের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে এখানে প্রশ্ন করিয়া কোনও লাভ নাই, শুধু ইহাতে যে বাঙ্গালী স্ত্রী-চরিত্রের গতানুগতিকতা-বর্জিত নূতন একটা দিকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার কথাই উল্লেখযোগ্য।

কানড়ার হৃদয়ে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাকে সে আশৈশব পতিরূপে কামনা করিয়াছে, সেই আজ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার প্রতিপক্ষের সেনাপতি হইয়া তাহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রণক্ষেত্রে লাউসেনের নিকট কানড়া এইভাবে আত্ম পরিচয় প্রদান করিল,—

এতেক বলিল যদি ময়নার নাথ।
ঘুঁড়ি পিঠে কানড়া যুড়িল দুটি হাত॥
বার সাত অমনি চরণে দণ্ডবৎ।
বদনে বসন দূর করিল ঈষৎ॥
বলিতে লাগিল বালা বিনয় বচন।
শুন মহাশয় রায় মোর নিবেদন॥
হরিপাল দুহিতা আমি প্রমাদে পড়িয়া।
পিতামাতা ভাই বন্ধু গেল পলাইয়া॥
কানড়া আমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।
পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা॥

মেসো গৌড়েশ্বর যাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া লাউসেন কর্ণ রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইলেন যে, 'বলে ধরে তোমারে পাঠান রাজধানে। হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে॥' শুনিয়া কানড়া বলিল—

ভবানী ভাবিয়া বালা বলে ভালো ভালো।
কোপে বিধুবদন ঈষৎ হ'লো আলো॥
বলে ধ'রে নিতে পারে কার এ'ত বুক।
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক॥
এখন বাঁচাই নাথ অনুমতি দে॥
না হয় দাসীর এক বাণ সয়ে নে॥

মরি যে তোমার হাতে মোক্ষ ফল পাব।
হানি যে তোমার শির সহমৃতা হব ॥

সংস্কার ও কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যবর্তী এই নারীচরিত্রটির সামান্য কয়টি মুখের কথায় এই যে অকৃত্রিম সাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে বুঝি তাহার তুলনা নাই। এই চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোনও অমূলক আদর্শকে অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই ইহার চিত্র এত জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়।

নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিকে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ অপূর্ব মহিমান্বিত করিয়া কল্পনা করিয়াছেন; ইহার কারণ, নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিই ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। শৌর্যবীর্যে, কর্তব্যজ্ঞানে, ধর্ম-বুদ্ধিতে তাহাদের যে কোনও দিক দিয়া কোনও অভাব নাই, বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সেই যুগের ব্রাহ্মণ কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের এই সমুন্নত ও উদার মানব চরিত্রের পরিকল্পনাই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসাবে সার্থকতার কারণ। অস্পৃশ্য ডোম জাতীয় চরিত্রের মধ্যেও যে কত মহত্ত্ব থাকিতে পারে, লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের চরিত্রটিই তাহার প্রমাণ। অবশ্য এই চরিত্রটি রামায়ণের রামভক্ত হনুমান-চরিত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া রচিত, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের কল্পনায় তাহা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাগরণ পালায় বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ-কল্প কাম্বাডোম যখন কালুকে সত্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক প্রার্থনা করিল, তখন কালুডোম বলিল,---

কি করিব কোথা হ'তে পরকাল মজে।
এ পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে ॥
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।
সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয় ॥
সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন ॥

সরল প্রকৃতির মানব-মন হইতে উৎসারিত ধর্মবিশ্বাসের অতি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এই কথাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাতে আদর্শবাদের লেশমাত্রও নাই।

কালু ডোমের পত্নী লখাইর চরিত্রেও অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর বাঙ্গালীসুলভ স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলির ইহাতে বিকাশ হয় নাই। কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিগত হৃদয়বেদনা পুরুষের মত নারীরও যে অনেক সময় বলি দিতে হয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই চরিত্রগুলিই তাহার প্রমাণ। পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গলে পুরুষ-চরিত্রের চরম অবমাননা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার স্থলে নারী-চরিত্রই মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। ময়নাগড় শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, লাউসেন নগরে অনুপস্থিত। কালুর হস্তে নগরের ভার অর্পিত আছে, কিন্তু কালু মায়া-নিদ্রায় অভিভূত। তখন লখাই স্বামীর কর্তব্যভার নিজে গ্রহণ করিল। পুত্রকে যুদ্ধে যাইবার জন্য বলিল, কিন্তু পুত্র অস্বীকৃত হইল। লখাই বলিল—

মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হ'লি।
তু বেটা তখনি কেন হ'য়ে না মরিলি ॥

স্ত্রী আসিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল,—

ময়ূরা বলেন নাথ তুমি কৈলে কি।
দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই॥
শাশুড়ী বিকল কান্দে শত্রু দেশ লেই।
মহাগুরুবচন রাজার লুন খেলে॥
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে॥
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে।
মর ত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে॥

বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের এই মহিমায় ধর্মমঙ্গল সমুদ্ভাসিত। মাতা এবং স্ত্রীর ভর্ৎসনায় শাকা নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। যুদ্ধে সে নিহত হইল। তখন মাতা লখাইর আর এক মূর্তি দেখিতে পাই,—

শোয়ায়ে সোনার খাটে শকায়ের শির।
ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর॥

এক পুত্র যে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, নিদ্রিত আর এক পুত্রকে জাগাইয়া জননী সেই যুদ্ধে তাহাকে পাঠাইতেছেন। বাঙ্গালীর জীবন কিংবা সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই।

ধর্মমঙ্গলের আর এক বীর চরিত্রের নাম ইছাই ঘোষ। সে ঢেকুর গড়ের অধিপতি। গৌড়েরসামন্ত রাজ কর্ণসেনের নিকট হইতে এই গড় সে নিজের পরাক্রমে অধিকার করিয়া লইয়া তাহার উপর সে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিল। গৌড়েশ্বর 'নব লক্ষ' সৈন্য লইয়া আসিয়া তাহার যুদ্ধকৌশলের সামনে পরাজয় স্বীকার করিয়া পলাইয়া গেলেন। ইছাই নিজের দুর্গকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিল, গৌড়ের সৈন্য বার বার পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র পার্বত্য ও অরণ্যাকীর্ণ রাজ্যটির স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সে দুর্জয় শক্তি অর্জন করিল। তারপর বহুদিন পর যখন তাহার রাজ্য প্রবলতর শক্তি দ্বারা পুনরায় আকান্ত হইল, তখন সে স্বদেশ রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল—

চমকিত দেখি সবে অতি নিদারুণ।
ছুটিল ইছাইর বাণ উগারে আগুন॥
চাপে দিল টঙ্কার হুঙ্কার বিপরীতে।
ঠাকুর লক্ষণে যেন রোধে ইন্দ্রজিতে॥

বাঙ্গালী যে বীরজাতি, ধর্মমঙ্গল না পড়িলে তাহা জানা যায় না।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানি কাহার রচনা? তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

২। চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদগুলি সর্বদা গান করিতেন বলিয়া তাঁহার চরিতকারেরা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাস কে? তাঁহার কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৩। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানির কাব্যমূল্যবিচার কর। কিভাবে ইহা রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে পরবর্তী ধারার যোগ রক্ষা করিয়াছে, তাহা বিচার কর।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানি কিভাবে কাহা কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে? ইহা আবিষ্কারের ফলে কি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে?

৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' বিষয়-বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

বিদ্যাপতি ও তাহার পদাবলী

১। বিদ্যাপতির জীবনী সম্পর্কে কি জানিতে পারা যায়, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

২। ব্রজবুলী কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে বাংলাদেশে প্রচার লাভ করিয়াছে?

৩। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি কে? তাঁহাকে 'বাঙ্গালী বিদ্যাপতি' বলিয়া উল্লেখ করিবার কারণ কি?

৪। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি হইতে বাঙ্গালী বিদ্যাপতি যে পৃথক্ ব্যক্তি তাহা আলোচনা করিয়া দেখাও।

৫। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন সম্পর্কে কি জান, তাহা লিখ।

৬। বিদ্যাপতির পদাবলীর বিশেষত্ব কি? বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদিগের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য ও ঐক্য কোথায় তাহা নির্দেশ কর।

৭। বিদ্যাপতির কবিত্ব সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

৮। বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

৯। বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি হইলেও বাংলায় তাঁহার পদাবলীর এত সমাদর হইয়াছিল কেন? তাঁহার রচনা হইতে ভাল দুইটি চরণ উদ্ধৃত কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুবাদ সাহিত্য

১। 'ভাগবত পুরাণের' প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেন? তাঁহার জীবন সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

২। ভাগবতের প্রথম অনুবাদক ও তাহার অনুবাদকারীর প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের কি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা প্রকাশ কর।

৩। মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদের কি উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন?

৪। মালাধর বসু 'ভাগবত পুরাণে'র কতটুকু অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন ? তাঁহার অনুবাদের বিশেষত্ব কি ?

৫। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই মালাধর বসু ভাগবত অনুবাদ করিবার প্রেরণা কোথায় লাভ করিয়াছিলেন ?

৬। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় হইতে তাঁহার জীবন-সম্পর্কে কি জানিতে পারা যায়, তাহা লিখ।

৭। কৃত্তিবাস কাহার আদেশে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় ? তাঁহার সংস্কৃত রামায়ণকে বাংলায় অনুবাদ করিবার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

৮। কৃত্তিবাসের অনূদিত রামায়ণের বিশেষত্ব কি ? তিনি বাল্মীকিকে কতদূর অনুসরণ করিয়াছেন ? রামওসীতার চরিত্র রূপায়নে তিনিকিরূপ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

৯। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইয়াছে, তাহার কি কারণ বলিয়া তোমার মনে হয় ?

১০। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বৈষ্ণব ধর্মেরকি প্রভাব অনুভব করা যায়, তাহা আলোচনা কর।

১১। মহাভারতের অনুবাদক সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর অথবা শ্রীকরণ নন্দী সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কি প্রভাব অনুভব করা যায়, তাহা আলোচনা কর।

৩। বাংলা সাহিত্যের প্রধানতঃ কোন্ কোন্ বিভাগ চৈতন্য ধর্ম ও চৈতন্যের জীবন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ কর।

৪। চৈতন্যদেবের জীবন দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য প্রভাবিত হইবার কারণ কি বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা আলোচনা কর।

৫। চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের কোন্ কোন্ নূতন দিক উন্মোচিত হইল তাহা উল্লেখ কর।

৬। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সমসাময়িক কালে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্য জীবনী সাহিত্য

১। চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের কিভাবে উদ্ভব এবং বিকাশ হইল, তাহা আলোচনা কর।

২। গোবিন্দ দাসের কড়চায় চৈতন্যদেবের যে চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। গোবিন্দদাসের কড়চার ঐতিহাসিক মূল্যকি তাহা বিচার কর।

৪। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

৫। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল'-এ চৈতন্য জীবনীর কি কি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাদের উল্লেখ কর।

৬। জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল'-এর ঐতিহাসিক মূল্য কি তাহা বিচার কর।

৭। বৈষ্ণব সমাজে জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে'র কি স্থান তাহা উল্লেখ কর।

৮। লোচন দাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এর বিশেষত্ব কি তাহা আলোচনা কর।

৯। 'লোচনদাস ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া কল্পনা ও কবিত্বের আশ্রয় লইয়াছিলেন',—এই উক্তি কতদূর সত্য তাহা বিচার কর।

১০। লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এর সঙ্গে জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এর তুলনা কর।

১১। চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাসকে 'চৈতন্য লীলার' ব্যাস বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য কি?

১২। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এ চৈতন্যের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব কি তাহা বর্ণনা কর।

১৩। 'চৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের জীবনী সম্পর্কে যাহা জানা যায়, তাহা লিখ।

১৪। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'-এ চৈতন্য জীবন অসম্পূর্ণ।'—ইহার অসম্পূর্ণতা কোথায় তাহা দেখাও।

১৫। বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্য ভাগবত'-এ কেবল চৈতন্যের জীবনী লেখেন নাই, সে যুগের সমাজের জীবনও লিখিয়াছেন।, এই সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব ততটুকু আলোচনা কর।

১৬। বৃন্দাবন দাস কাহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন? তাঁহার সম্পর্কে 'চৈতন্য ভাগবত'-এ তিনি কতদূর আলোচনা করিয়াছেন?

১৭। বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্য ভাগবতে' চৈতন্যের জীবনীকে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আদর্শে গড়িয়াছেন, সেইজন্যই তাঁহার কাব্যের নাম 'চৈতন্য-ভাগবত।'— আলোচনা কর।

১৮। বৃন্দাবনের 'চৈতন্য ভাগবত'কে অনেকে চৈতন্য জীবনীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কেন ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা হয়, তাহা আলোচনা কর।

১৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কে? তাঁহার সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

২০। চৈতন্য জীবনী সম্পর্কে চৈতন্য ভাগবতের মত একটি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বর্তমানে থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ খানি রচনার কি কারণ ছিল, তাহা উল্লেখ কর।

২১। চৈতন্য জীবনী সাহিত্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থখানির কি স্থান তাহা আলোচনা কর।

২২। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ খানির মধ্যে চৈতন্য জীবনীর শেষাংশ বা তিরোধান বৃত্তান্ত কিভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখাও। এই সম্পর্কে অন্যান্য জীবনী রচয়িতা কি লিখিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ কর।

২৩। 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য

১। দ্বিজ চণ্ডীদাস কে ছিলেন? তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় কি জানা যায় তাহা উল্লেখ কর।

২। দ্বিজ চণ্ডীদাসের কবিত্ব সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

৩। 'দ্বিজ চণ্ডীদাস ভাবের কবি—রূপের কবি নহেন।' এই উক্তির সার্থকতা বিচার কর।

৪। বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডীদাসের সম্পর্ক কি তাহা আলোচনা কর।

৫। চণ্ডীদাস নামক কয়জন কবি ছিলেন বলিয়া তোমার মনে হয়? তাহাদের মধ্যে কোন্ চণ্ডীদাস তোমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ?

৬। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের বিশেষত্ব কি? তাঁহাকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হয় কেন?

৭। জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের 'ভাবশিষ্য' বলা হয় কেন? তাঁহার সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

৮। বৈষ্ণব কবি হিসাবে লোচন দাসের কি স্থান? তাঁহার কবিত্বের বিশেষত্ব কি, তাহা আলোচনা কর।

৯। শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে গৌরাঙ্গ বিষয়ে পদ রচনার ধারা প্রবর্তিত হইবার কারণ কি? গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনায় কোন্ কবি সর্বাপেক্ষা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন?

১০। কয়েকটি বাৎসল্য রসের পদাবলী অবলম্বন করিয়া ইহাদের রচনায় বৈষ্ণব কবিগণ যে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা কর।

১১। অভিসার বর্ণনার শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁহার রচনার বিশেষত্ব কি তাহা নির্দেশ কর।

১২। নিম্নলিখিত পদকর্তাদিগের সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ :—
রামানন্দ রায়, বলরাম দাস, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, মাধবেন্দ্র পুরী।

১৩। গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের অর্থ কি? গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনার প্রবর্তক কে? তাঁহা সম্বন্ধে কি জান?

ষষ্ঠ অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

১। মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে? প্রধান মঙ্গল কাব্যগুলিকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? তাহারা কি কি?

২। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। মনসা-মঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

৪। 'বিজয় গুপ্ত মনসা-মঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।' আলোচনা কর।

৫। মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগরের চরিত্রটির বিশেষত্ব কি তাহা নির্দেশ কর।

৬। মনসা-মঙ্গলের বেহুলা চরিত্রটির সার্থকতা বিষয়ে আলোচনা কর।

৭। 'মনসা-মঙ্গল করুণ রসের কাব্য'—আলোচনা কর।

৮। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৯। 'চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম।' তাহার সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

১০। মুকুন্দরাম যে তাঁহার একটি সুদীর্ঘ আত্মবিবরণী দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করি তাঁহার গৃহত্যাগের বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর।

১১। 'মুকুন্দরাম দুঃখ বর্ণনার কবি, দুঃখের কথায় তিনি বড়—সুখের কথায় নহেন।'— আলোচনা কর।

১২। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার চরিত্রটি আলোচনা কর।

১৩। ধর্মমঙ্গল কাহাকে বলে? ইহার নাম ধর্মমঙ্গল কেন?

১৪। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৫। ধর্মমঙ্গলের কবি ময়ূর ভট্ট সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ।

১৬। ধর্মমঙ্গলের কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলীর জীবন ও কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৭। ধর্মমঙ্গলের কবিরূপে রূপরাম নামে দুইজন কবির নাম পাওয়া যায়। তাহাদে পরিচয় দাও।

১৮। মঙ্গলকাব্যে অঙ্কিত স্মরণীয় নারীচরিত্রগুলির আদর্শ ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও